KAMAKSHI

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

কামাক্ষী

গার্গী ভট্টাচার্য

শান্তনুকে ----

মা সরস্বতী ও নীল সরস্বতীর

কৃপাধন্য লেখিকা --

এই বইটি শুরু করার আগে আমি পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই আগের বইগুলিতে যেই সমস্ত বানান ভুল হয়েছে অথবা টাইপো দেখা গেছে তার জন্য । যেমন ডিজিটাল পলাশ বইতে একটি কবিতা আছে তন্‌হাই নামে সেখানে রাগেড্ গাড়ি হয়ে গেছে রাগেট । খুলো না কবজ কুন্ডল অনির্বাণ -কবিতায় অবশ্যি ওটা আমি কবজই লিখেছি । তাবিজ কবজ আর কি -

ভুল হওয়া উচিৎ ছিলো না । আরো অসংখ্য ভুল দেখা যায় যার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত । আসলে বাংলা সফট্ওয়্যার (আমার কাছে যা আছে) তার বালখিল্যপনা ও আমার নিজের চোখ এড়িয়ে যাওয়া দুইয়ে মিলে এই গোলমাল ।

ঈশ্বর আর পাঠকেরা আমাকে যথেষ্ট দয়ামায়া করেন বলেই আবার নড়বড়ে অক্ষর নিয়ে কামাক্ষীর পবিত্র হোমশিখায় স্নান করতে এসেছি ।

ক্ষমাটা ধরে রাখবেন , কয়েক মূহুর্ত আরো - প্লিজ ---- !!!

এখানে আমি অনেক ছদ্মবেশী কবিতা জুড়ে দিয়েছি গল্পের শেষভাগে । এই পদ্যগুলি আমারই লেখা তবে নানান ছদ্মনামে । সবই আমার সোনাঝুরি ওয়েব পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিলো । এছাড়া দুটি ছোট গল্পও আছে এখানে । একটি গল্পর নাম বিষুবরেখা- যা কিনা সাহসী

গল্প বলে একটি পত্রিকা প্রত্যাখান করেছিলো তবে ভালো মেসেজ দিচ্ছে সেটা বলেছে ।

এই বইতে আমি যতটা সম্ভব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছি তবুও কিছু **মানুষী এরর্** থাকবেই কেননা কিছুই পার্ফেক্ট নয় । অন্তত: আমার ।

একজন লেখিকা, যে কোনোদিন বাংলার কোনো বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পায়নি তার একের পর এক বই, **অ্যামাজনের** বিভিন্ন দেশের সাইবার হাটে- বেস্ট সেলার হয়ে যাচ্ছে --এই ঘটনা অভূতপূর্ব ।

এগুলি সাধারণত:জ্ঞানী-গুণী মানুষ ও নামী লেখকদের হয় । বাজারে বই এলেই বেস্টসেলার হয়ে যায় ।

আমার মতন অর্ধশিক্ষিত , আনকোরা , অপরিচিত লেখকদের হয়না ।

এর ৫০ শতাংশ কৃতিত্ব আমার স্পিরিচুয়াল গুরু-- শ্রী রমণ মহর্ষির আর বাকি ৫০ শতাংশ কৃতিত্বের দাবীদার আমার পাঠক- পাঠিকারা ।

এইসব চমৎকার ব্যাপার স্যাপার দেখে দেখে আমিও লোভী মানে গ্রিডি হয়ে গেছি । তাই ছদ্মনামে লেখা কবিতাগুলি- বই হিসেবে প্রকাশ করছি । খুব একটা মন্দ কিছু বলে মনে হয়না ।

আমার স্বামী শান্তনু বলেন : তুমি লিখতে ভালোবাসো না সেটা সবসময় বলো কিন্তু একের পর এক বই লিখে চলেছো দেখি ।

আসলে লেখা আমার প্যাশান নয় । আমি গান রেকর্ড করে ইউ-টিউবে আপলোড করতে অনেক বেশি ভালোবাসি । মিউজিক ইজ এমবেডেড্

ইন মাই সোল । এবং অনেক গানের লিরিক্স আমি জানি না । তাতে আমার সঙ্গীত সাধনায় কোনো অসুবিধে হয়না ! কারণ আমি স্বরচিত লিরিক্স দিয়ে গানটা গেয়ে ফেলি । ততক্ষণাৎ রচিত বলে কথাগুলির হয়ত তেমন তাৎপর্য থাকেনা । কিন্তু থাকে সুর । আর সেই সুরই অত্যন্ত সাধারণ লিরিক্স আর শব্দে ; প্রাণ সঞ্চার করে। একে কী বলবেন ?

ভেরি ভেরি গার্গীয়ান- (**GARGIAN**) !!

KAMAKSHI

-a story of rejection and resurrection by Gargi Bhattacharya

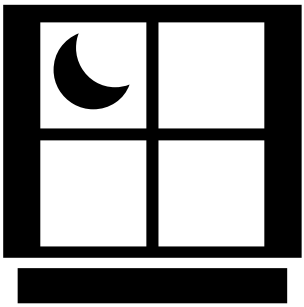

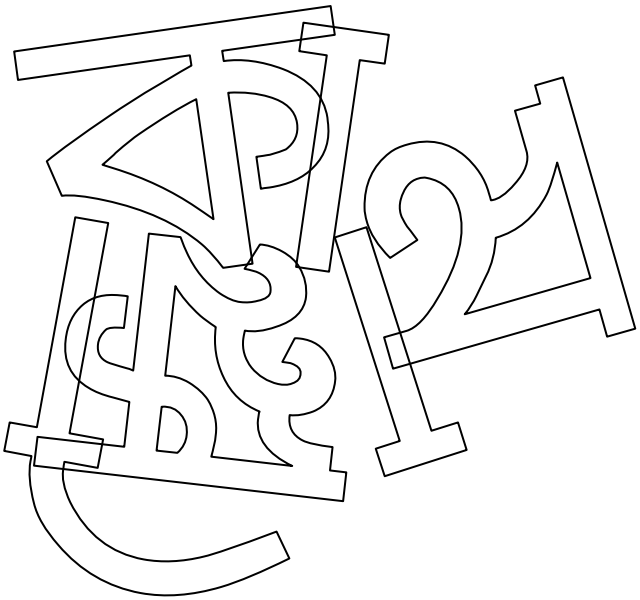

লখিমগড় একটি দুর্গ শহর । বাংলার নিচের দিকে, একটি দ্বীপে এই দূর্গ । প্রায় পুরোটা অংশই দূর্গ ।

এই পরিত্যক্ত দূর্গে গড়ে উঠেছে এক বসতি । প্রাচীনকালের কোনো এক রাজা এই দূর্গে থাকতেন ।

একদিন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দলে দলে এই রাজ্যের মানুষ দুর্গ পরিত্যাগ করে পালায় । পরে শোনা যায় এখানে হঠাৎ করে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়েছিলো । মানুষ মারা যাচ্ছিলো । দেহের কলকব্জা হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো । একটি জনবহুল দ্বীপ কেমন যেন রাতারাতি পরিণত হল এক অন্ধ কুটিরে ।

সত্যি কি ভূত ছিলো ? পিশাচ কিংবা অন্যগ্রহের জীব? যার নষ্টামিই তার আহলাদ ?

মনে হয়না । বেশিরভাগ এইজাতীয় স্থানে যা হয় তাই হয়েছে আদতে । কোনো বিষাক্ত গ্যাসে মানুষ মারা যেতে শুরু করে । হয়ত ভূতলে কোনো রসায়নের বেরসিক ক্রিয়া হয় । কোনো ফাটল মারফৎ সেই প্রাণঘাতী গ্যাস দূর্গের লোকালয়ে প্রবেশ করে ও মানুষের ক্ষতি হতে থাকে ।

এই পরিত্যক্ত জায়গাটি বিষমুক্ত করেন প্রযুক্তিবিদেরা । এখন এখানে থাকে অনেক মানুষ ! তারা এক দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে । উদ্বাস্তু সবাই । সেই দেশে মিলিটারির অকথ্য অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে দিন কাটায় । অনেকে পালিয়ে এসে এখানে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গেড়েছে ।

মানুষগুলি হলুদ পাখির মতন । হ্যাঁ , ঐরকমই ওদের গাত্রবর্ণ । ক্ষুদে চোখ আর চ্যাপ্টা নাক । দেহের উপরিভাগ নিচের থেকে সাইজে বড় । কোমড় থেকে পায়ের পাতা অনেক ছোট ।

ভীষণ হাসিখুশি জাত ওরা । চোখের চামড়া কুঁচকে হাসছে সমানে । যেন কোনো দু:খ ওদের স্পর্শ করতে পারেনি ।

এখানে মানুষগুলি এসে খুঁজে পায় এক নতুন জীবিকা । অ্যাসবেসটস্ এর কারখানা গড়ে ওঠে অনেক । সেখানে কাজ করে ওদের দিন কাটতে থাকে । মূল জীবিকা হল এইসব ফ্যাক্টরিতে কাজকম্মো ।

এইসব সরল মানুষগুলির অবশ্যই একটি জটিল সমস্যা আছে । ওরা যেহেতু নিজেরা সবাই হলুদ ও সোনালি মানুষ তাই এই চত্বরে কেউ কৃষ্ণবর্ণ নেই । বাইরে থেকেও খুব বেশি কেউ আসেনা কারণ দূর্গের বিরাট সব দ্বার চারদিকে । সেখানে থাকে পাহারাদার ।

সম্প্রতি অ্যাসবেসটস্‌ের নানান দোষত্রুটি বেরিয়ে পড়াতে তার গুণগুলি নিয়ে আর কেউ চর্চা করেনা ।

অনেক প্রাণঘাতী অসুখ হয় এই দ্রব্যের জন্য, সেগুলি প্রমাণিত । সেই জন্য স্থানীয় সরকার এই বস্তুটি ব্যবহার করতে বারণ করেছেন এই লখিমগড় অঞ্চলে । মানুষের রুটিরুজির ব্যাপার হলেও স্বাস্থ্যের কারণে আবার রাতারাতি অন্য জীবিকার খোঁজ শুরু করেছে ।

এখানে আবার ভয়ানক সব মাকড়্সা দেখা যায় । স্পাইডার মিউজিয়াম আছে । একজাতের মাকড়্সা তো রীতিমতন সুবিশাল সাইজের আর কুত্‌কুতে চোখে তাকিয়ে নেয় শিকারের দিকে ; তারপর ছুঁড়ে মারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ । সোজা ভাষায় শক্‌ দিয়ে দেয় ।

মা দুর্গার দশ-হাত দেখলে অনেকের মনে হয় স্পাইডার ; আর এই অতিকায় স্পাইডারকে আর যাইহোক নির্ঘাত মা দুর্গার মতন দেখতে নয় ! তবুও এর নাম ডার্গা । কো- ইন্সিডেন্স ।

একজাতের মাকড়্সা মানুষকে তাড়া করে । ওদের নাম লালচাম্‌ড়ি । একজাতের ক্ষুদ্র মাকড়্সা গায়ের সংস্পর্শে এলে লালা ছোড়ে । তাতে দগদগে ঘা হয়ে মানুষের দেহে বিষের সঞ্চার হয় । আবার রামধনুর মতন বরণ যেই মাকড়্সার , তার কাজ হল জীবজন্তুর দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে, দেহ তাক্‌ করে লালা নি:সরণ । সে খুবই ক্ষুদ্র । নখের ওপরে এঁটে যায় ।

এইসব নানান প্রজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের নিয়ে গবেষণার জন্য পোকাবিদ্ প্রফেসর নরসিংহ মানে নরসিম্হান্ এখানে এসে জুটেছেন অনেককাল আগে । আজকাল কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওঁর ল্যাবে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাজের জন্য ।

উনিও ওঁর প্রতিপত্তি খাটিয়ে আরেকটি ল্যাব শুরু করেছেন এখানে ।

পোকা নিয়ে গবেষণা করে যারা তাদের বলে entomologist –

প্রফেসর নরসিম্হন্ দয়ার সাগর । দ্বিতীয় ল্যাবের উদ্দেশ্য মানুষের ভালো করা -পোকাদের সাহায্য নিয়ে । উনি মনে করেন এখানে খুঁজলে মাকড়্সা ছাড়াও অন্য অনেক পোকা উঁকি মারবে --কারণ দূর্গের বয়স অনেক । কাজেই পোকাদের আড্ডায় ভরা এই ফোর্ট,নব নব কীট আর পতঙ্গ -ডিস্কভারির জন্য একেবারে উপযুক্ত জায়গা !

নির্জন মাটিতে ছিলো অনেকদিন , এখন তারা লুকিয়ে পড়েছে দুপেয়ের ভয়ে । সন্ধান করলে অনেক নতুন নতুন চমকে দেবার মতন পোকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে ।

এছাড়া ঝিঁঝিঁ পোকার গান তো শোনাই যায় । কাজেই ঝিঁ ঝিঁ বিশারদেরা সদলবলে আসুন । লখিমগড়ে । দূর্গ ঘুঙুরের সন্ধানে ।

কেউ হয়ত বলে ওঠে : পাহাড়ে যে টিং টিং করে বেলের মতন বা ঘুঙুরের মতন আওয়াজ শোনা যায় সেটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক । প্রফেসর হেসে বলেন : অনেক পাহাড়ে হয়ত তাই কিন্তু আমাদের এখানে, এই

লাল রং এর **ফ্লা** পাহাড়ে যে ধ্বনি শোনা যায় তা আদতে মন্দিরের ঘন্টার আওয়াজ !

শুনে উপস্থিত সবাই উচ্চস্বরে হেসে ওঠে ।

ভদ্রলোক একটু ক্ষ্যাপাটে । লুনি । অনেকে প্রফেসর লুনি বলেও সম্বোধন করে , আড়ালে অবশ্যই ।

সামনে বললেও উনি কিছুই মনে করবেন না । ওঁর এই এত্তোবড় , এই এত্তোটা সাইজের একটি হৃদয় আছে । উনি নিজেকে নিয়ে হাসতে ও জোকস্ বলতে পারেন ।

পাঞ্জাবীদের মতন । সর্দারজীদের নিয়ে আমরা কত্না জোক্স বলি । কিন্তু ওঁরা কখনই রাগেন না । স্পোর্টিং-লি নেন ।

দুই দেশের গল্প আছে না ?

অনেকবছর ধরে যুদ্ধ হল । এক দেশের সেনাবাহিনী এমনই যুদ্ধ করেছিলো যে ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ পথে পথে । কিন্তু শেষে যোদ্ধারা যখন নিজ দেশে ফিরে যেতে উদ্যত হল , যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে তখন সেই দেশের মানুষ হাপুস নয়নে কেঁদে বললো : কোথায় আর যাবে তোমরা ? এতদিন এখানে ছিলে এখনও থেকে যাও । তোমরা চলে গেলে আমাদের ভারি দু:খ হবে ।

মানব ধর্মটাও যে একটা ধর্ম যেখানে ক্ষমা ও প্রেম আছে বিন্দাস ভাবে সেটা হয়ত এই ঘটনা প্রমাণ করে ।

আগেকার দিনে যেমন বড় বড় খেলোয়াড়েরা অনেকেই ,প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলার মাঠে লড়াই করলেও বাস্তব জীবনে গভীর মিত্রতার সুত্রে বাঁধা ছিলেন । আজকালকার মতন একে অন্যের শত্রু হয়ে উঠতেন না । এইসব স্মৃতিই হয়ত আমাদের নতুন আলো দেখায় ।

আবার স্বপ্ন দেখায় ।

প্রেজেন্ট তো পাস্টের ওপরে ভিত্তি করেই হয় । যা করে গেছে পূর্বজরা তাইনা দেখে আমরা শিখি । তাই ক্ষুদ্র হলেও, উজ্জ্বল এক মোমশিখা দেখা যায় সদাই --ক্ষয়াটে জীবাশ্মর নিচে ।

প্রফেসর লুনির এক মেয়ে ছিলো । ছিলো বলছি কারণ সে এখন আর নেই । মারা গেছে মাত্র ২৪ বছর বয়সে এক দূর্ঘটনায় । মেয়েটি অসাধারণ রূপবতী ছিলো ।

সায়রা বানুর মতন । খুব প্রাণবন্ত ও সরল ।

মানুষজন ওকে এবং ওর বাবা মাকে বলতে শুরু করলো যে একে সিনেমায় নামিয়ে দিন অথবা মডেলিং করতে ঢোকান । ভারত, আবার জগৎ সভায় আরেকটি লাবণ্যময়ী ও চমৎকার মেয়ের যোগান দেবে ।

কিন্তু বাবা ও মা যাই বলুন না কেন মেয়েটি ,যার নাম ছিলো শুভা সে বেঁকে বসে ।

সে বলে যে মেয়ে বলেই এইসব দিকে তাকে যেতে হবে কেন ? সে কেন এমন কোনো কাজ করবে না যাতে নারীদের নাম অন্যভাবে উজ্জ্বল হয় । সিনেমা, মডেলিং এসব তো হল অনেক !

শুভা স্থির করে যে সে এমন কিছু করবে যা আগে সেইভাবে কোনো মেয়ে করেনি ।

অনেক ভেবে টেবে সে পাইলট হল । কিন্তু নাহ্ ! সাধারণ প্লেন অথবা যুদ্ধবিমান চালানোর কোনো উৎসাহ তার নেই । সে চালাতে শিখলো হট এয়ার বেলুন । ভারতের মেনল্যান্ডে এখন বেশ কিছু হট এয়ার বেলুন কোম্পানি শুরু হয়েছে । তারা বেলুনে করে মানুষকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ঘোরায় । ধরুন লুপ্ত সভ্যতা -বাদামী কিংবা তুঙ্গভদ্রার তীরে সেই হাম্পি মানে বিজয়নগর , এসব জায়গা আপনি বেলুনে চড়ে ঘুরে দেখতে সক্ষম হবেন । পুরো সভ্যতাটি দেখা যাবে -কম সময়ে । খুঁটিয়ে । এইরকম আর কি । আর অনেক উঁচু থেকে ।

শুভা খুব তাড়াতাড়ি একজন সফল হট এয়ার বেলুন পাইলট হিসেবে নাম করলো । সবাই ওর বেলুনে চড়ে উড়তে চায় । সে সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ অবধি । ও যখন চাকরিতে যোগ দেয় তখন একটাই শর্ত রেখেছিলো । টিকিটের দাম যেন আকাশছোঁয়া না হয় ।

ওর মালিক ইতস্তত: করেন প্রথমে । কিন্তু দেখা যায় এমন অনেক যাত্রী এসে হাজির হয় যাদের টিকিটের দাম ও নিজেই দিয়ে দেয় । বলে : আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন ।

মালিক -রাজস্থানের মানুষ সিশোডিয়া হেসে বলে ওঠেন : আপনি এক কাজ করুন মাদাম । আপনি পাইলট না হয়ে সোসাল ওয়ার্কার বনে যান।

এতো কামে দিলে তো হামার বেওসা উঠে যাবে !

একদিন এক কর্মী জানতে চায় --- আপনার বাবা কোনো ফোর্টে থাকেন শুনেছি । আপনি কি কোনো মোনার্কের ফ্যামিলি থেকে এসেছেন ? এত এক্সট্রা পয়সা কোথায় পান ? যে বিলিয়ে বেড়ান ?

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র । মিষ্টি হেসে বলে শুভা : আমার বাবা ও মা এক দূর্গ শহরে থাকেন । তবে আমার বাবা কোনো দেশের বা স্টেটের রুলার নন ।

এহেন ভালো মনের, সৎ মেয়েটি কিছু বছর পরেই বেলুন ফেটে মারা যায় । অনেকে বলে ওর মুসলমান প্রেমিকের কাজ । সেও পাইলট ছিলো তবে চাকরি পায়নি । কাজ ভালো পারতো না হয়ত । হিংসার কারণে শুভাকে মেরে ফেলেছে । কেউ বলে নিছকই অ্যাক্সিডেন্ট । আবার কেউ বলে সুইসাইড ।

শুভার বাবা মায়ের মতে এটা দূর্ঘটনা হওয়াই সবচেয়ে ন্যাচেরাল । মেয়েটি দস্যি তো ! হয়ত কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলো !

ওর প্রেমিক ফিরোজ আর বিয়ে করেনি অবশ্য । প্রফেসর নরসিম্হান্ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীকলাকে, আজও ভিন্নধর্মের এই ছেলেটি বাবা-মা বলেই সম্বোধন করে ।

আর হ্যাঁ , সে এখন কমার্শিয়াল পাইলট ।

প্রথমে গরু খায় বলে শ্রীকলার খুব আপত্তি ছিলো । পরে ছেলেটিকে দেখে মন গলে যায় । অসম্ভব বিনয়ী ও ভদ্রমানুষ । পরোপকারি । নিজের চাকরি নেই তবুও গরীব দু:খীদের দান করতো । অড্ জব করে যা আয় করতো তার থেকে ।

তাকে যখন লোকে বৌ পোড়ানোর জন্য সন্দেহ করতে শুরু করলো তখন প্রফি ও শ্রীকলা , বাড়িতে লোক ডেকে জানালেন যে তাদের মেয়ে একটি অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয়ে এই জগৎ ত্যাগ করেছে । এর সাথে ফিরোজ কোনো ভাবেই যুক্ত নয় ।

এমনই ছিলো তাঁদের প্রাক্তন হবু-জামাতা প্রেম ।

ফিরোজ আর শুভা একসাথে থাকা শুরু করেছিলো ।

শুভার আসল নাম ছিলো শুভলক্ষ্মী । ওটাকে ছোট করে শুভা করে নেয় সে । ফিরোজ আর শুভা একেবারে পার্ফেক্ট জুটি নাহলেও ওদের মধ্যে বেশ ভালই মিল ছিলো । তা সোনায় সোহাগা আর কোন দম্পতির হয় ?

ওর বাবা-মা এও বলেন যে দূর্ঘটনা নাহলেও ,মেয়ে তো আর ফিরবে না ! কাজেই কোনো তিক্ততা তাঁরা রাখতে চান না মনে, এগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও জল ঘোলা করে । ফিরোজ ভালো আছে । শুভাও যেখানে গেছে , শান্তিতে থাক্ । মেয়ে গেছে কিন্তু ছেলেকে সন্দেহের কারণে ওঁরা হারাতে একেবারেই অনিচ্ছুক ।

এহেন ভালোমানুষ প্রফেসর ও তাঁর পত্নী একদিন দূর্গের ভেতরে , সবুজ বনের গালিচায় একটি কালো কুচকুচে মেয়েকে দেখতে পান । শিশুটিকে কেউ যেন ফেলে দিয়ে গেছে !

এই এলাকায় এত কালো কেউ নেই । সবাই হলুদ পাখি । হলুদ রং এর মানুষ । বাইরে থেকে যারা কাজে এসেছে- যেমন নরসিম্হান্ ও আরো কিছু ল্যাবের মানুষ ও অন্যরা , তারাও কেউ এত কালো নয় ।

বাদামী মানুষ কিছু আছে । সংখ্যায় তারা বেশ কম ।

কিন্তু আলকাত্রার মতন এই কালো মেয়ে কোথার থেকে এলো সে এক বিস্ময় ! দূর্গের দরজা তো সব পাহারাদারদের কবলে ! আর এই দ্বীপে এই শিশুকে কেইবা আনবে ?

মেয়েটির মাথা ভর্তি কুচকুচে কালো কোঁক্ড়া চুল । কুতকুতে দুই চোখ মেলে চেয়ে আছে আর কাঁদছে ।

সদ্য জন্মেছে এরকম মনে হয়না । খুব বড়ও নয় অবশ্য । হয়ত বছর খানেক হবে বয়স ।

মেয়েটি উঠে বসছে । হাত পা ছুঁড়ছে । আবার নেতিয়ে পড়ছে ।

শ্রীকলা আগে দক্ষিণ ভারতের পথে বাটার মিল্ক বিক্রি করতো । একটা গাড়ি ঠেলে ঠেলে ফেরি করতো । কমবয়সে বাবাকে হারায় । মা ও মেয়ে, এই বাটার মিল্ক ও দোসা -ইড্‌লি বিক্রি করে দিন কাটাতো ।

প্রফেসর তো লুনি ! সমাজের উপকার করার জন্য, ক্লাস টেন পাশ এই নিম্ন মধ্যবিত্তের মেয়েকে ঘরে আনেন, পত্নীর মর্যাদা দিয়ে । তবে উনি ঠকেন নি ।

শ্রীকলা কিন্তু অসম্ভব ভালোমেয়ে । এত সুন্দরভাবে প্রফেসরের সংসার সাজিয়েছেন, একমাত্র মেয়েকে ভালো সংস্কার দিয়েছেন । একটা আয়নার মতন মন ও চারিত্রিক দৃঢ়তা যা ছিলো শুভার অতি আপন, তা তো ওর বাটার মিল্ক বিক্রি করা- ফেরিওয়ালা মায়ের কাছ থেকে ধার নেওয়া । দক্ষিণী শ্রীকলা তার চারুকলার মাধ্যমে ,দ্রাবিড় নীল -নরসিম্‌হান্‌ এর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান । তাই এইবার কি আর ফেলে দেবেন এই অসহায় কালো মেয়েটিকে ?

শ্রীকলা দক্ষিণী হলেও ওঁকে দেখতে জাপানী পুতুলের মতন । এখানকার মঙ্গোলিয়ান লোকেদের কাছাকাছিই কিছুটা ! এখন প্রশ্ন উঠছে একটাই !

জাপানী গুড়িয়া কী করবেন ? কৃষ্ণভামিনীকে বুকে তুলে নেবেন ? আবার নতুন করে স্বরলিপি নিয়ে বসবেন ? নিজের মেয়ে তো আর নেই ! নাকি সব কিছু দেখেও ,চোখ বন্ধ করেই থাকবেন বেশিরভাগ মানুষের মত ।

প্রফেসর কিছুটা চিন্তায় পড়ে যান । আবার ভাবেন-- ইউনিভার্স তাঁকে একটি ফ্রেস মেয়ে দিয়েছে । উনি কী করে অবজ্ঞা করবেন ? এই দান ওঁর হাত পেতে নেওয়া উচিৎ !

অবশেষে, শ্রী রাজি হলেন মেয়েটির দায়িত্ব নিতে । সবাই দূর-ছাই করলো । এত্তো কালো একটা মেয়ে ! অ্যাফ্রিকা থেকে উড়ে চলে এসেছে মনে হয় , পরিযায়ী পাখিদের ডানায় ভর দিয়ে !

কোথার থেকে এলো এই অচিন দেশের -উদ্ভট জীব ?

ওহ্-হো ! বলা হয়নি ; মেয়েটিকে দূর্গের পরিত্যক্ত কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের কাছেই পাওয়া যায় বলে ওর নাম দেওয়া হয় কামাক্ষী । ডাকনাম সানা । ওকে একদল নেকড়ে, পাহারা দিচ্ছিলো বেশ কিছুদিন । সেটা পরে জানা গেলো । এই নেকড়ের দল রহস্যময় । এরা এই দ্বীপে থাকে বটে তবে কারো কোনো ক্ষতি করেনা । আপন মনে থাকে । ওই মন্দিরের দিকেই বেশি থাকে ।

এই এলাকার মানুষের মধ্যে- একধরণের মানুষ আছে তারা পশু শিকার করে । ওদের বলা হয় দেগানি । কৈশোর থেকেই এই দেগানিরা তাদের বাবা মায়ের দেওয়া শিকড় বাকড় খেয়ে দেহে অদ্ভুত এক বল আনে । তারপর ওদেরকে জ্যান্ত পশুর সামনে ছেড়ে দেওয়া হয় ।

জংলী ; এইসব খাঁচায় রাখা পশুর সাথে লড়াই করে করে ওরা বেড়ে ওঠে । শিকড়ের কারণে চোট বা আঁচড়ে মরেনা কেউ ।

দেগানিরা ,এই লখিমগড় দ্বীপের সমস্ত অরণ্যে হানা দেয় । সঙ্গে শিক্ষা নিতে চাওয়া কিশোরেরা । কিন্তু নেকড়েদের ডেরায় ওরা যায় না । কেন কেউ জানে না ।

নেকড়েরা মানুষের ক্ষতি করেনা । অনেকে বলে ওরা কামাক্ষী দেবীর বাহন । ওদেরকে সবসময় দেখাও যায়না । পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় ওরা যেন ভুঁই ফুঁড়ে বার হয় ।

আমাদের মানুষী কামাক্ষী- যার ডাকনাম সানা তাকে কেন নেকড়ের দল রক্ষা করছিলো সেটাও কেউ সঠিক জানেনা । পোকা বিশারদ্ প্রফেসর ও বিজ্ঞানীর এইসব আজগুবি তথ্য ও গল্প নিয়ে কোনো চিন্তা নেই । উনি মনে করেন দুনিয়ার সমস্ত কিছুই কোনো না কোনো কারণে ঘটে । কিছু কিছু কারণ আমরা জানতে পারি- কিছু কিছু আমাদের আয়ত্ত্বের বাইরে ।

হিউমান মাইন্ড দিয়ে সবসময় সবকিছুর বিচার করা যায়না । তার মানে এটাও নয় যে সেই ঘটনার কোনো লজিক বা কারণ নেই ।

প্রতিপক্ষের সাথে এই নিয়ে বচসা করেন না । নিজের মতের মতন অন্যের মতকেও সম্মান দেওয়া ওর রক্তে । কাজেই রক্তারক্তি হয়না দেগানিদের সাথে ।

---একটা শিকড় খেয়ে যদি বাঘ সিংহের মোকাবিলা করা যেতো তাহলে এত লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেন না ।

এটা ওঁর মনের কথা হলেও, মুখে আনেন না ।

দুনিয়ায় এইমূহুর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শান্তি কেকের । শান্তি আইসক্রীমের । আর যুদ্ধের দামামা বাজাতে চান না এই ক্ষুদ্র জনপদে ।

তবে একটা জিনিস ওঁর মনে হয় , সেটা হল- মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় কমিউনিস্ট হলেন গড্ । যদিও কমিউনিস্ট ফিলোসফি বলে তারা এইসব ঈশ্বর টিশ্বর মানতে রাজি নন কারণ এগুলি কুসংস্কার কিন্তু এই প্রফির মনে হয় যে গড্ বলে কেউ যদি থেকে থাকেন তাহলে তার কাছে সবাই সমান বলেই বলা হয় । কাজেই তার থেকে বড় কমিউনিস্ট আর কে আছেন ? এইসব জাতপাত , উঁচু নিচু সমস্ত তো মানুষের তৈরি । নাহলে মুসলিমরা নিরাকার ব্রহ্মে নিবেদিত , হিন্দুদের কোটি কোটি দেবতা আবার জৈনদের ঈশ্বর অন্যরকম , বৌদ্ধ্যদের আলাদা , শিখদের ভিন্ন । এই মহান্ ভারতে এতগুলো ধর্মের জন্ম হয়েছে । যেগুলি দুনিয়ার প্রথমসারির ধর্ম । হিন্দু, জৈন,বৌদ্ধ্য ,শিখ । আর ব্রাহ্ম-সমাজ , আর্য সমাজ ও অতীব পুরনো আকবরের দিন-ই-ইলাহি তো আছেই । কিন্তু পথ সবার আলাদা হলেও ডেস্টিনেশান সেই নির্গুণ , নিরাকার ব্রহ্ম- যাঁর কাছে ব্রাহ্মণ , মুচি , মোল্লা , খ্রিস্টান মিশনারি , হরিজন , কবি, বৈজ্ঞানিক, কেরানি , শেফ্, পশুপাখি , ই-টি , মাঙ্গলিক , অপ্সরা , কিন্নরী সবাই সমান । ধর্মগ্রন্থ এগুলি শেখায় । কাজেই গড্ সত্য হলে প্রফির কাছে উনিই সবথেকে বড় কমিউনিস্ট ।

কমিউনিজম্ একটি অবাস্তব জীবনদর্শন । তাকে আরো ভ্রষ্ট করে লোলুপ কমিউনিস্টরা । একইভাবে, ধর্মকেও হিংস্র করে কমিউনিস্ট গড না, সো কলড্ ধর্মযাজক আর ধর্মচ্যুত ধার্মিকেরা ।

শ্রীকলা, মেয়েটির দায়িত্ব নেন হয়ত ঈশ্বর সবচেয়ে বড় কমিউনিস্ট বলেই । সাজিয়ে তোলেন কালো মেয়ে কামাক্ষীকে । আদরের সানা । সানা সোনা । মেয়েটি দিনে চব্বিশ -পঁচিশ বার ফিট হত । বয়স বাড়লেও বুদ্ধি যেন শিশুদের মতন । একই রকম সরল । লোকে বলতে লাগলো যে মা ও বাবা হয়ত এই জড়বুদ্ধি মেয়েকে সামলাতে পারেনি তাই ফেলে গেছে । হয়ত তারা চেষ্টা করেছিলো কিছুদিন ।

শ্রীকলা অতি যত্ন নিয়েই মেয়েকে মানুষ করছেন ।

নিজ সন্তানের মতন । আগের মেয়ে ছিলো দস্যি । ডানপিটে । আর এই নতুন মেয়ে খুবই শান্ত । চুপচাপ । এইভাবেই ভাবেন উনি ।

মাঝে মাঝে মেয়েকে রেখে বাইরে কোথাও যান ঘুরতে । তখন ওকে দেখাশোনা করে এক বৃদ্ধা , নাম তার চাপিলা কিন্তু মানুষ ওকে ডাকে তুয়া লোলাচয় বলে । লোলাচয় ওরা ঠাকুমাকে বলে । আর তুয়া মানে সবুজ শাক । ভদ্রমহিলা, বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত খাদ্যরূপী শাক-সবজি তুলে নিয়ে এসে সেদ্ধ করে খায় । সাথে ভিক্ষা করে পাওয়া, মোটা চাল আঁঠা আঁঠা করে সেদ্ধ করে নেয় ।

ভিক্ষা করে করে এখন ধনী । কিন্তু কৃপণ । টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছে এক পাতানো পুত্রের পরামর্শে ।মনটা নরম ।আর বুড়ি কিপ্‌টে হলেও দরদী ।

তুয়া লোলাচয় অর্থাৎ শাক-ঠাম্মা পরম আদরের সাথে কেল্টুকে দেখাশোনা করে ।

কেল্টু নাম দিয়েছে এলাকার দুষ্টু পোলাপানেরা । তারা ওকে একা দেখলে ঢিল মারে । মেয়েটি তো একধরণের অবুঝ তাই কেবল কাঁদে ।

লোলাচয় ওকে আগলে রাখে । তুয়া তুলতে সারা বন চষে ফেলে । ওকে পিঠে বেঁধে নেয় সাঁওতাল রমণীর মতন । নিজে থাকে একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের এককোণায় । মন্দিরটি , কামাক্ষী দেবীর ভাঙাচোরা মন্দিরের কাছেই । সেখানে ভিক্ষা করে পাওয়া সব টাকা একটা বড় মাটির হাঁড়িতে রেখে দিয়েছিলো । পাতানো ছেলে হিমল তামাং ওকে বোঝায় যে এত টাকা এইভাবে ফেলে না রেখে ব্যাঙ্কে দিলে- ওর মতন অনেক গরীব মানুষের উপকার হতে পারে । তারা দরকার হলে ঐ টাকা ধার নিতে পারে ।

এইসব বুঝিয়ে ওকে দিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলায় হিমল । আসলে হিমলের কেউ নেই । বুড়ি ভিক্ষা করে ওকেও নেমতন্ন খাওয়ায় । অন্য সময় যুবকটি এই দ্বীপরক্ষার কাজ করে অর্থাৎ সিউকিরিটির চিফ্ । আগে কমান্ডো ছিলো । বিশেষ কাজে শত্রু দেশের সীমা পার হয়ে গিয়েছিলো । ওরা যুদ্ধবন্দীর মতন ব্যবহার করার আগেই পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় । তখন সাঁতরে এই দ্বীপে এসে ওঠে । মেনল্যান্ডে আর যায়না । কী করবে সেখানে গিয়ে ? ওর আপন বলতে আজ আর কেউ নেই । আর কমান্ডোর কাজও আর করবে না ।

সীমানা একটা কাঁটাতার নয় আসল সীমানা থাকে মানুষের অন্তরে , কাঁটাতার একটা মেটাফোর মাত্র তা নাহলে শত্রু দেশের অচেনা বুড়োবুড়ি ঐভাবে ওকে ওদের তৈরি বিশেষ কফিনের নিচে শুইয়ে সীমারেখা পার করিয়ে দেবে কেন ? ওপরে শুয়ে ছিলো ওদের ছেলে , মড়া সেজে । কাজেই হিমল জানে আসল সীমারেখা মানুষের মনে । বাইরে কোনো পার্থিব বস্তুর মধ্যে নয় ।

ও ছোট থেকেই শ্রীলঙ্কার মার্শাল আর্ট অঙ্গম্‌পোঢ়া ও দক্ষিণী সিলামবত্তম শিখেছিলো । সিলামবত্তম যুদ্ধে, নানান আজব অস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় শিকারী পশুর দেহলতা ও পায়ের আন্দোলন , তাদের আক্রমণের নানান কলাকৌশল ।

ও চিরটাকালই অত্যন্ত ডানপিটে । আর ইতিহাস ছিলো ওর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় । ভারতের বিভিন্ন রাজা , মহারাজা ইত্যাদিদের কথা পড়ে ও অত্যন্ত এক্সাইটেড্ হত । ভাবতো যেন কোনো রাজার যুদ্ধক্ষেত্রে ও লড়াই করছে । টাইম মেশিনে করে চলে যেতো অশোক , রাণা প্রতাপ , হর্ষবর্দ্ধন , চালুক্য নরেশ পুলকেশী ইত্যাদির রণভূমে । সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে । গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো তার । নিজেকে পূর্বজন্মে কোনো রাজা অথবা রাজনন্দন অর্থাৎ সত্যিকারের বীরের ভূমিকায় বার বার মন ক্যামেরার দেখতো । আচ্ছা ও কি চেতক মানে রাণা প্রতাপের প্রিয় অশ্বকে দেখেছে ? যখন সম্রাট আকবর, দু:খের ভারে নয়নে নিয়ে আসেন বৃষ্টিধারা তারই শত্রু ও একমাত্র রাজা যিনি সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন নি , বার বার সমস্ত ডিপ্লোম্যাসি ফেল করিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র

একটি বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছেন সম্রাটের যোদ্ধাদের সাথে সেই রাণা প্রতাপের মৃত্যু সংবাদ শুনে তখন হিমল কি সেখানে ছিলো ?

কাজেই এই ছেলে যে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, নিবেদিত হবে দেশবাসীর মঙ্গলার্থে কমান্ডো সংগ্রামে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই ।

ও তো শত্রু শিবিরে ঢুকে দেখতে গিয়েছিলো তারা কী ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারে আর তখনই ধরা পড়ে যায় । তার আগে ও সেই শিবিরে একজন দোভাষী হিসেবে কাজ করছিলো । অবশ্যই ছদ্মবেশে ।

ধরা পড়ার পর পালিয়ে আসে । আর কমান্ডোর কাজে যোগ দিতে চায়না । ওর মনে হয় : রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায় । তাতে ওর যাই ভূমিকা হোক্ না কেন আদতে রাজনীতিবিদ্ ইত্যাদিদের উচিৎ শান্তির সেতু গড়া । নাহলে ক্ষণিকের জন্য হয়ত এক বীর কমান্ডো কিছু প্রাণকে, নষ্ট হবার হাত থেকে জীবনপণ করে বাঁচাবে কিন্তু অশান্তির বীজ থেকে যেই মহীরুহর জন্ম সেই বীজ ধ্বংস না করলে অসংখ্য আগাছা গজিয়ে উঠে একেবার মূল থেকে নষ্ট করে দেবে সভ্যতা ।

কাজেই হোয়াই কমান্ডো ? এই বাটনের যুগে যেখানে একটি বোতাম টিপে লক্ষ লক্ষ জীব হত্যা করা সম্ভব সেখানে একটি বা কয়েকটি বোতাম টিপে কেন অসম্ভব শান্তি বারি মানব সমাজের ওপরে ছিটিয়ে দেওয়া ? হোয়াই ?

আর কোনোদিন যেন কোনো কমান্ডো তৈরি করতে না হয় ট্যাক্স পেয়ারদের অর্থ দিয়ে -তাদের সুরক্ষার জন্য ।

কথাগুলি কাব্যিক হলেও একটি চিন্তা দিয়েই শুরু হয় বিপ্লব ।

কল্পনা আর স্বপ্ন- এই দুটি জিনিস দিয়েই সজ্জিত হয়- পরবর্ত্তী যুগ । তবুও যুদ্ধ বন্ধ মনে হয় বাস্তবে প্রায় অসম্ভব ।

টেররিজম্ যেমন একটি স্ফুলিঙ্গ ছিলো , পরে হল চিন্তার সোপান, আরো চিন্তা --সেরকমভাবে মানব চেতনায় শান্তির বারি ছিটিয়ে দেওয়া, সেটিও একটি প্রাথমিক চিন্তা ; স্পার্ক । চিন্তা করতে করতেই তো একদিন সেটা বাস্তব জগতে নেমে আসে । ইতিহাসই তার সাক্ষী । স্পার্ক থেকেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড শুরু হয় আবার স্পার্ক থেকে জেগে ওঠে প্রিয়জনের চিতা । চিতার আগুন বিধ্বংসী নয় তা মোমের আলোর মতন নরম । একটি মৃত চেতনাকে, অ্যাস্ট্রাল ওয়ার্ল্ডে যেতে সাহায্য করে চিতার লেলিহান অগ্নিশিখা । পার্থক্য শুধু দেখার ।

চিতাতেই সব শেষ যা কিছু তার ছিলো পার্থিব । তারপর কেবল স্মৃতির মণিকোঠায় । মননে । চিন্তনে । স্পর্শ হয়ত আর নেই কিন্তু রয়ে গেছে হর্ষ । কোয়ালিটি টাইম কাটানোর অনুরণন মনের গভীর নাট্যশালায় । এখন বসন্ত উৎসব কেবল মনে মনে । বর্ণ- গন্ধ -আভা সবই রয়েছে শুধু মনের আলোতে তাদের দেখা যায় । যেসব ইমোশান্স, চিতার দাউ দাউ আগুনের কারণে তখন মনে আসেনা, সেগুলি আগুন থেমে গেলে মনে ভেসে ওঠে । কতনা প্লেজেন্ট থট্স ! কাজেই আগুন এক বিপ্লব । স্বহা স্বহা ধ্বণির একটি ছন্দ আছে । আছে নতুন স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা । আছে চিত্রনাট্যে নতুন রূপ ছোঁয়ানোর কাঠকুটো ।

আর কমান্ডোর কাজ করতে গিয়ে ওকে বাতে ধরেছে । আর্থ্রাইটিস । দেহের অধিকাংশ হাড় ওর ভাঙা । একটা চোখে ৪০ শতাংশ কম দেখে ।

কিন্তু বাস্তবে -শয়তানের শয়তানি বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব । তাই নতুন বীর , তারুণ্যে ভরপুর কয়েকটি তাজা জীবন প্রতি মূহুর্তেই কাউকে রক্ষার জন্য জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ।

যতটা রক্ষা এরা সিভিলিয়ানদের করেন তার বদলে যথেষ্ট সম্মান ও ফাইন্যান্সিয়াল সুবিধে পান কি -পরিবার পরিজনের সুরক্ষার জন্য ?

এন্ড অফ দা ডে , ওরাও তো মানুষ -আর মানুষ কেন ওরা মহামানুষ !

আধুনিক মানুষ কেবল নিতে জানে , দিতে জানেনা । আর কমান্ডোরা ঠিক উল্টোটা । ওঁরা দেবার জন্য জন্মান । নেবার জন্য নয় ।

এইডস্ রোগে আক্রান্ত সুন্দরী , মোহিনীদের এগিয়ে দিয়ে সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত করা- এই বিষকন্যার দ্বারা , একপ্রকার বিনা যুদ্ধে অথবা রূপসী এসকর্টদের যাদের এক একটি ভঙ্গিমা ও জাদুকরী মাধুর্যে পাগল শত্রুপক্ষের কর্তারা , তাদের দেহে রেডিও-অ্যাক্টিভ বস্তু ইনজেক্ট করে কর্তাদের স্লো পয়জন করে বিকিরণে মেরে ফেলা ---এতসব ইলেক্ট্রিফায়িং বুদ্ধিগুলি মানুষ অন্যান্য গঠণ মূলক কাজে লাগাতে পারে ।

হয়ত এখন লোকে মঙ্গলে পা দিচ্ছে কিন্তু এই গ্রহের ইগোর লড়াই নিজেদের কন্ট্রোলে না রাখতে পারলে মঙ্গলে সভ্যতা গড়ার আগেই সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে । সমস্যা , মানুষ কি করতে পারে আর না পারে তাই নিয়ে নয় সমস্যা মানুষের দূর্বুদ্ধি কতদূর যেতে পারে আর কী কী ক্ষতি

হতে পারে তার জন্য সেটা নিয়ে । নিজেকে না শুধরে গ্রহান্তরে গিয়েও কোনো লাভ নেই ।

সেখানেও আবার কমান্ডো বাহিনী লাগবে । কারণ আবার রূপসী রেডিও অ্যাক্টিভ এসকর্ট , এইডস্ রোগাক্রান্ত মোহিনী এইসব মোহরের প্রয়োজন হয়ে পড়বে ইগোর লড়াই কন্ট্রোল করতে । আর এগুলি গল্প নয় ।

গল্প মানুষকে আনন্দ দিতে পারে , সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে তবুও গল্প হল গল্পই । অধিকাংশ গল্প সত্যি হয়ে গেলে সমূহ বিপদ ।

আর যা সত্যি সত্যিই একদিন সত্যি হতে পারে তা তো ভয়ানক মনে হলে আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় ।

হিমলের মা, খুব ছোটবেলায় মারা যান । বাবা এয়ারফোর্সে প্লেন সারাতেন । গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার । এয়ার ফ্রেম নিয়ে কাজ করতেন । শৈশব থেকেই সে ফাইটার প্লেনে চড়তে অভস্থ্য । বাবা ওকে নিয়ে অফিসে যেতেন ওর স্কুল ছুটি থাকলে ।

বাবার কাজের জন্য খুব নাম ছিলো । অন্য এয়ার ফোর্স স্টেশান থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতো প্লেন সারাবার জন্য । আর বাবা অসম্ভব সাহসী ছিলেন । বলতেন -- সাহসে ভর না করে যারা জীবন কাটায় তারা প্রতিপদেই অপদস্থ হয় । এক গালে চাটি খেলে , শত্রুর গালে দশটা থাপ্পড় মারবে । আর কোনোদিন ভিক্ষা করে খাবে না । আমি কোনো নেপালি ভিখারি দেখলে, মেরে তার হাত ভেঙে দেবো ।

ওদের পরিবারের মূলমন্ত্র হল ::সাহসে ভর করে বাঁচো । অসুখে ভুগে আশি বছরে মৃত্যুর চেয়ে যুবক হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া অনেক বেশি গর্বের ব্যাপার ।

সেই একই বাবা বিকলাঙ্গ কিংবা হাত পা নেই , অন্ধ এরকম কোনো মানুষ ভিক্ষা করছে দেখলে দু আনা হলেও দিয়ে দিতেন । তবে কমান্ডো হিমলের জীবনদর্শন হল-- আবেগ ও সাহস ,এই দুটোর ব্যালেন্স করে লাইফবোট নিয়ে নামা উচিৎ জীবন সাগরে ।

যেমন ওর উপস্থিত বুদ্ধি খুব বেশি তাই প্রফেসর নরসিম্হানের এক অনুজ ওকে বলেছিলো যে ও বুদ্ধিমান কিন্তু ওর বাস্তব ও উপস্থিত বুদ্ধি বেশি । ইন্টেলেকচুয়াল দিকে ও অ্যাভারেজ কিংবা বুদ্ধুও হতে পারে ।

হিমল হেসে সরে গেছে । কিন্তু মনের গভীরে সে জানে যে বুদ্ধি মাপা যায়না । জগতে তারাই সেরা বুদ্ধিমান যারা মগজের সাথে সাথে আবেগকেও জায়গা মতন ব্যবহার করে । নিজ স্বার্থের জন্য অথবা অন্যকে হেয় করার জন্য বুদ্ধিকে যারা কাজে লাগায় তারা আইনস্টাইনের নাতি হলেও হিমলের কাছে নিরেট গাধা । যারা প্রকৃতির কৃপায় মগজাস্ত্রের অধিকারী হয় তারা গিফটেড্ সন্দেহ নেই । যে কোনো কারণেই । কিন্তু মনুষ্যত্ব আর মায়া-মমতা যদি হৃদয়ের গভীরে জারিত না হয় তাহলে বাঁচে না সভ্যতা । মানবধর্ম । বুদ্ধিতে শাণ দেওয়া আর মমতা লালন করা ,একই রকমভাবে দরকার । তবেই সমাজে শ্রদ্ধা ভালোবাসা পাবে বুদ্ধিমান মানুষ । নাহলে হিটলারের মতন ঘৃণা ও অভিশাপের বলি হবে । বুদ্ধি যেমন ইউনিভার্স দিয়েছে সেরকম জীবজগতের উপকারের জন্য কাজ করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ । যেসব বুদ্ধিমানেরা এগুলি লালান পালন করেন- তাদেরকেই বলা হয়

সভ্য মানুষ । কালচার্ড । কেবল মুখে কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা আর মুখোশের আড়ালে নোংরামো করা এবং সাজসজ্জায় রুচির পরিচয় দেওয়া অথচ অন্তরে কদর্য এক রূপ লালন পালন করা কোনো কালচারের পরিচয় দেয়না । তাদের কালচার্ড বলেনা , বলে স্কাউন্ড্রেল ।

কামাক্ষীকে তুয়া লোলাচয়ের কাছে রেখে প্রফি লুনি ও শ্রীকলা কিছুদিনের জন্য বাইরে ঘুরতে যান । আদতে এখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের জন্যও কিছুটা যান । একটি নতুন হোটেল খুলেছে , সেখানে ফিরোজের বান্ধবী , আফগান মেয়ে গুলনার কাজ করে ; ওটা মেনল্যান্ডে । সেকেন্দ্রাবাদের কাছে এক গ্রামীণ এলাকায় । ওটা ইকো টুরিস্ট স্পট । সেখানে অনেক নতুন ছেলে ও মেয়েকে ওরা ট্রেনিং দেবার জন্য কাজে নিচ্ছে । অল্প মাইনে । পরে কাজ শিখে গেলে ওরা নিয়ে নেবে অথবা অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দেবে । গুলনার আফগান হলেও বহু পুরুষের বাস ভারতে । ফিরোজের সাথে আলাপ হায়দ্রাবাদে ।

খুব বন্ধু দুজনে । মেয়েটি আগে পক্ষী বিশারদ ছিলো । ঠিক বিশারদ নয় পক্ষীকূলের শিস্ ও শব্দ নিয়ে গবেষণা করতো । পাখির গান শুনলে

মনটা ফুরফুরে হয়ে যায় । একটা কোমলভাব আসে দেহে । এই নিয়েই গবেষণা । অনেকটা **Autonomous sensory meridian response** (**ASMR**) মতন । একটা ইউফোরিয়া সৃষ্টি করে মনে । পাখির সরল সুরে কোমল গান কিংবা ডাক, শিস্ ।

বৈজ্ঞানিকভাবে কিছু প্রমাণিত নাহলেও ওরা চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি । এই প্রাকৃতিক ধ্যানের কল্যাণে অহেতুক ছটফটানি মূহুর্তে কমে যেতে পারে বলে ওরা মনে করে । স্ট্রেস ফ্রি ইন মিনিট্স্ অ্যান্ড ইট ইজ ফ্রি । সুন্দর সুন্দর পাখিগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে গেলেও তো আনন্দ হয় । আজকাল মানুষের হাতে সময় কম । স্ট্রেস খুবই বেশি । সবাই তো দৌড়ে অংশ নিয়েছে । ঘুমের পনেরোটা বেজে গেছে ।

মিষ্টি পাখির ডাক শুনলে যেন ঘুমেও দুই চোখের পাতা বুজে আসে । মধুময় , মধু ঝরাতে ওস্তাদ পাখিরা । অ্যান্ড ইট্স্ ফ্রি !!

আফগান মেয়ে গুলনার, মেনল্যান্ডে ঐ হোটেলে কাজ করে । প্রকৃতির মধ্যে এই হোটেলের চারপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত । ধান চাষ , বোনা, তোলা সবই দেখা যায় ঘরের জানালা দিয়ে । নিজে গিয়ে ধানগাছের বীজ বোনা , চারাগাছ নিয়ে নাড়াচড়া করা এক হাঁটু জলে নেমে আবার মধ্যাহ্নে আলের ওপরে বসে চাষী মেয়েদের মতন সস্তার টিফিন বাক্স থেকে সাধারণ কেজো মানুষের খাবার খাওয়া এক অ্যাডভেঞ্চার । আজকাল বড় বড় অট্টালিকা যার পোশাকি নাম অ্যাপার্টমেন্ট সেখানে বন্দী মানুষ , সবুজের থেকে শতহস্ত দূরে । দূরে- প্রাকৃতিক জলাশয় , মাটি আর নীল আকাশের আদিমতা থেকে । তাই আজকাল আর্বান বাবুরা কড়ি দিয়ে

সবুজ প্রকৃতি কিনে আনেন বৌ ছেলেমেয়েদের জন্য । এইরকমই এক জায়গা এই হোটেল । কিছু সুযোগসন্ধানী কাজে লাগাচ্ছে এই দূর্বলতাকে । ফেলো কড়ি মাখো সর্ষের -ঘানি থেকে আসা তেল । ধান চাষ নিজ চোখো দেখো , বদলে দাও চাষীদের ডোনেশান ।

বকলমে হোটেল ফান্ডে ।

গুলনার ফিরোজকে ভালোবাসে । মন দিয়ে । কোনো হোটেলের ব্যবসা বাড়াবার মতলবে নয় । তাই তো লখিমগড়ের বাসিন্দাদের জন্য এই সেবার ব্যবস্থা করেছে । নাহলে ওরা জানতেই পারতো না । ফিরোজ হয়ত একদিন পুরোপুরি ভুলে যাবে শুভলক্ষ্মীর কথা । গুলনার ওর বেগম হবে সেদিন । আশায় বাঁচে গুলনার , গুলবাহার । তাজা গোলাপ বুকে নিয়ে!

ইকো হোটেলের নাম -দিশা । ভোরাই লাল হয় পাখির ডাকে আর রাতে ব্যাঙের ডাক, অতি কর্কশ স্বরে শোনা যায় । কেমন যেন বুনো বুনো গন্ধ আসে মানুষের গা থেকে । রাতপাখির নৈশ অভিযান সুরেলা হয় ব্যাঙের গানে । কোলা ব্যাঙ না সোনা ব্যাঙ বেশি সুরেলা তাই নিয়ে তর্ক হয় মাটির ঘরে , খড়ের চালের নিচে । কড়ি দিয়ে মাটি কিনতে আসা , সবুজ কিনতে আসা আর্বান বাবু বিবিদের মধ্যে । হাতে অনেকের দেশী মদের বোতল । কেউ বা মহুয়া , হাড়িয়াও মাটির গ্লাসে ভরে নেয় । আজ সব আদিম আদিম-- কোনো শহুরে পণা নেই আর ।

এক বিবি নাম তার ডল বা ডলু তিনি একটি টিয়া পাখিকে বাঁচিয়েছেন দূর্ধর্ষ বাজপাখির ছোবল থেকে । টিয়াকে নিয়ে আদ্যিখেতা চলেছে । টিয়াকে কথা বলতে শেখাচ্ছে । কেউ বা বলছে : আরে আগে ও সুস্থ হোক্ , ভয় কাটুক ওর , স্বাভাবিক হোক্ তারপর তো কথা !

ডলু এসব সিলি থিংক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ।

ও রাতারাতি টিয়াকে বাক্যবাগীশ করেই ছাড়বে ।

--বলো **Aaradhya threw a tantrum at the airport….!!**

এবার কিছুটা ধমকে ওঠে ওর স্বামী গুপী নয়, ললিত গাইন । বলে : আরে আরাধ্যা একটা শিশু । সে কী করছে না করছে তাকে **tantrum** ইত্যাদি শব্দে অ্যাড্রেস করছো কেন তোমরা ? তোমার নিজের মেয়ের সম্পর্কে এরকম বললে তোমার ভালোলাগতো ? ও একটা বাচ্চা মেয়ে ; জন্মের সময় থেকে ক্যামেরা ওকে ধাওয়া করছে কিছু বোঝার আগেই । আরে ওর নিজের তো স্পেস আছে একটা -সেটা ওকে দাও । সেলিব্রিটিরা আর তাদের কাছের মানুষেরাও তোমার আমার মতন রক্তমাংসে গড়া ।

ললিতের জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে বন্ধু জনি বিশ্বাস বলে : এই হল বিখ্যাত হওয়ার বিড়ম্বনা । সেলিব্রিটিরাও মিডিয়াকে কাজে লাগায় আর মিডিয়াও ওদের , সুযোগ বুঝে । একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ।

ডলু মানুষের সাথে মেশে কার কোন ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে আর কে কি ধরণের মদ্যপান করে তাই দেখে ।

--দেখো বাবা, আমি অনেক জন্ম ধরে অনেক পুণ্য করে এখানে এসে পৌঁছেছি । আর আমি খুব **pragmatic;** দারিদ্র্য যে কী জিনিস আমি অনুমান করতে পারি । একটা পুওরের সাথে আমি কেন ওঠাবসা করবো ? ইভোলিউশানের ঐসব সিঁড়ি আমি বহু আগেই পার করে ফেলেছি । সমাজের লক্ষ্য এগিয়ে চলা , পিছিয়ে পড়া নয় । আর ফাইনান্স তো বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । নয় কি ?

প্রায় মধ্যরাতে আর তর্ক করার মুড ছিলো না ললিতের । কাজেই কথা না বাড়িয়ে ঘরে গিয়ে নরম বিছানায় ঢলে পড়লো । খড়ের ঘর হলেও এই হোটেলের ভেতরটা ইকো নয় । এ-সি , আভিজাত্য , বাথটাব, কাফেটেরিয়া , বার , বার মেড সবই সুসজ্জিত রয়েছে প্রতিটি কোণায় । হয়ত ডাকলে আসবে মধুলোভী ভোমরাও । বাইরেটা অবশ্যই ইকো ইকো । ভেতরে সোনার সাঁকো ।

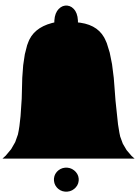

এক্স কমান্ডো হিমলের কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই । ছিলো না কোনোদিনই । নানান দোষমুক্ত সে । কোনো এফ্লিকশান্ নেই ওর চরিত্রে । ওকে দেখলে কেউ ব্রুস্ লি অথবা জ্যাকি চ্যান বলবে না । বরঞ্চ ওকে দেখতে দাঁড় গোঁফবিহীন **Keanu Reeves-** এর মতন । মানুষও ভালো মিস্টার রিভস্ এর মতনই ।

বেচারার একটাও মেয়ে বন্ধু নেই । ও অবশ্য নিজেকে বেচারা বলতে রাজি নয় । ওর মনে হয় যে ও এখনও ওর সোলমেট পায়নি । সেক্স- ফেক্সের জন্য ও বিয়ে করবে না । এমন একজনকে বিয়ে করবে সে- যে ওকে সঙ্গ দেবে ইমোশনাল ও স্পিরিচুয়াল লেভেলে । হয়ত সেজন্যেই কেউ আসেনি এখনও । ওর নানান উন্মাদনা রয়েছে । সেগুলির সাথে যে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে তাকেই ও সঙ্গিনী করতে চায় ।

রূপ থাকলে ভালো নাহলেও কিছু যায় আসেনা । মেয়েরা ওর কাছে ট্রফি নয় , মানুষ । সমস্ত দোষ, গুণ আর ভালো মন্দ নিয়ে জলজ্যান্ত মানুষ । সবার হাইট-ওয়েট-কালার আর মুখের ছাঁচ তো পার্ফেক্ট হতে পারেনা কিন্তু অন্তরে ইচ্ছে করলেই সবাই নিঁখুত হতে পারে । ও সেরকম একজনকেই চায় । আরেকটা ব্যাপার হল এই যে ওর স্ত্রী যেন ওকে আনকন্ডিশনাল লাভ দেয় । এটা ওর মূল চাহিদা ।

ইদানিং হয়ত ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন । একটি মেয়ের সাথে বেশ ভাব হয়েছে । তা এই বয়সে ভাব তো হবেই । মেয়েটি মিষ্টি দেখতে । ল্যাপা পোছা , হলুদ মেয়ে হলেও খুবই স্নিগ্ধ , সাবলীল । প্রাণবন্ত । দরদী । মায়াবন বিহারিণী হরিণী । মেয়েটির নাম জুনিরা । লোকে জুন বলে সম্বোধন করে ওকে ।

ওকে ভালোলাগে হিমলের । হিমল কথা কম বলে । যা রোজগার করে তার অনেকাংশ বিলিয়ে দেয় । কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত এখন বেকার কারণ মন্দির তো বন্ধ হয়ে গেছে । ভগ্ন রূপ তার ।
সেই পুরোহিতের কাছে দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে হিমল ।
জুন আবার তার দুই সন্তানকে ফ্রিতে লেখাপড়া শেখায় । জুনের কাজ ভাস্কর্য নিয়ে । তবে সে একটু ভিন্নজাতের ভাস্কর । যেসব জিনিস মানুষ ফেলে দেয় সেইসব জিনিস নিয়ে ও সৃষ্টি করে অপরূপের ।

ভাঙা কাঁচের চুড়ি , ছেঁড়া কাপড়, মাদুর, জুতো , ফেলে দেওয়া কাঠকুটো , লোহা-লক্কর , কাগজ এইসব দিয়ে জুনিরা মানে জুন চমৎকার সব আকৃতির সৃষ্টি করে। মোমের মতন হয়ে ওঠে পরিত্যক্ত বস্তুগুলো । গার্বেজ আর আবর্জনা হিসেবে জমা থাকেনা । ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট আর রিসাইকেল বিন থেকেও যে তৈরি করা যায় এক একটি কোনারক কিংবা তাজমহল সে নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত । শিল্প জুনিরার শৈল্পিক মনে , দক্ষ দুই হাতে ।

ক্রাফটের কাজ আর মূর্তি গড়া করতে সে মেনল্যান্ডেও গিয়েছিলো । পুরো পাঁচ বছরের কোর্স করে এসেছে এইসব নিয়ে ।
অনেক নামী দামী শিক্ষকের সাথে কাজ করেছে ।
তাই হয়ত এই দ্বীপের অধিকাংশ ময়লাই ,আজকাল ওর স্টুডিও-তেই চলে যায় । ইতিউতি জমে থাকেনা আর দৃষ্টিকটূ গার্বেজ । কী করে এই চমৎকার সম্ভব হয় সেটা জানতেই গিয়েছিলো হিমল । সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলো কয়েকটি ছেঁড়া ইলেকট্রিকের তার । সেই বাতিল তার দিয়ে সাতদিন পরে তৈরি হল একটি আরবী পুরুষ । পেঁচিয়ে--কেমন যেন

একসাথে সবগুলি জুড়ে । মাথায় বসলো ডেনড্রাইটের ফেলে দেওয়া মানুষের মাথাওয়ালা ঢাক্না টি ।

এখন তাই এটাকে মনে হচ্ছে কোনো আরবী পুরুষ -রং চং এ পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। জোব্বা পরে নয় !

শতছিন্ন তার দিয়ে, এটা যে কেউ করতে পারে- না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় । ইচ্ছে করেই তারগুলো বেশি করে কেটে নিয়ে গিয়েছিলো হিমল । দেখা যাক্ শিল্পীর কত্তো ক্ষমতা ! কেমন করে সৃষ্টি করবে অনন্য রূপ, এই ছিন্নভিন্ন ইলেকট্রিকের আলোক তন্তু দিয়ে --কোন সে কেরামতিতে , দেখাই যাক !

শেষে একটু লজ্জা করছিলো হিমলের । নিজের ওপরে কেমন বিরক্তি আসছিলো । নাহ্ ! সবাইকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই । কিছু কিছু জিনিস আছে জগতে যা বিনা পরীক্ষায় মেনে নিতে হয় । তাতে মনে শান্তি আসে আর পরে লজ্জিত হবার কোনো কারণ থাকেনা ।

অ্যাসবেস্‌টসের কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বহু মানুষ চলে যায় অন্যান্য জায়গায় । অনেকেই আছে এখনও । তাদের কাজের ব্যবস্থা করছে অনেকে । নতুন প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে । অনেকে বাইরে যাচ্ছে ইদানিং নতুন কোনো কাজের সন্ধানে । অনেক মানুষ অরণ্য থেকে পাখির বাসা যোগাড় করে, তার থেকে ডিমগুলি নিয়ে, কৃত্রিম উপায়ে **তা** দিয়ে ফুটিয়ে সেই পক্ষী শাবকগুলিকে বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করছে ।

যারা পাখি পোষে অথবা নানান পাখির মাংস খায় , তারা ঐসব শিশু পাখিদের কিনে নিয়ে যাচ্ছে । কখনো কখনো এই পক্ষী ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এইসব পক্ষীশাবকদের মেনল্যান্ডের নানান নগরে ও গ্রামে চালান করছে । অর্থাৎ অনেক নতুন নতুন কর্মধারা এই দ্বীপে নিত্যদিনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে । কেউ কেউ ধনীদের দালানে গিয়ে প্রক্সি মানুষ হচ্ছে । মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের সন্তানদের সামনে আড়ং ধোলাই খাচ্ছে । বাচ্চাকে দেখানো হচ্ছে যে সে কোনো অপরাধ করলে এইভাবে তাকেও টর্চার করা হবে । কাজেই লাইভ শো-তে অংশ নিয়েও মোটা রোজগার হচ্ছে কারো কারো ।

কী করবে মানুষ ?

নিজেদের অসহায় অবস্থা থেকে বেরোতে গেলে কিছু না কিছু তো করা চাই । শুধু অ্যাসবেসটস্ শিল্প থেকে এক লাফে তো আর ডিজিট্যালে পদার্পণ করা যাবে না ! এইভাবে টুকরো টুকরো জুড়েই চলবে ক্ষুধা নিবারণ আর অর্থ উপার্জন । রং -চটা সমাজে আসবে হোলি । পুষ্প গন্ধ । ধীরে ধীরে । মোহনবাঁশী , সুগন্ধা চাঁদনী ---।

জুনের স্টুডিও তেও সে বেশ কিছু লোককে নিয়োগ করেছে ।
একদিন কথায় কথায় হিমল ওকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে কামাক্ষীর গল্প বলে । কেমন নেকড়ের দল ওকে পাহারা দিতো আর কীভাবে ওকে প্রফি খুঁজে পেয়েছেন আর তার স্ত্রী শ্রীকলা ওকে কোলে তুলে নিয়েছেন সেসব গল্প ।
জুনিরা হেসে বলে --- তোমার প্রফি ও তার লক্ষীমন্ত বৌ না থাকলে মেয়েটির কী হত ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে । কিন্তু ওর মা বাবার জন্যও আমার সহানুভূতি আছে ভালই । এতবার ফিট হচ্ছে একটি বাচ্চা , তাকে কী করে হ্যান্ডেল করবে মানুষ ? রোজ হাসপাতালে যাবে নাকি হাসপাতাল চত্বরেই ঘর বানাবে ? এটা কোনো প্রাকটিক্যাল সলিউশান নয় । ভয়ানক কালো গায়ের রং বা কোঁকড়া ঝুলঝাড়ুর মতন চুলটা যদি বাদও দিই তবুও ।
এরকম একটা শিশুকে বড় করা খুব মুস্কিল । ভালই করেছে ফেলে দিয়ে । এটা একটা বাড়তি বোঝা ।

এই কথাগুলি হিমলের খুব একটা ভালোলাগেনি । তবুও মুখে বলেছে শুধু : বাপ মায়ের কাছে বাচ্চা হল সন্তানই । সে কানা , খোঁড়া , ল্যাংড়া যাইহোক না কেন । পেরেন্ট আর কিড্ লাভ দিয়ে জোড়া, স্নেহ

মায়ামমতার বাঁধনে বাঁধা । ওখানে চেহারা অথবা স্বভাব কর্পূরের মতন যেন উবে যায় । তবে এটা আমার একান্তই নিজস্ব অনুভূতি । আমি তো বাবা হইনি !

জুন খুব জোরে হেসে ওঠে । হলুদ মেয়ে আজ পরেছে মেরুন পোশাক । হাতে ও কানে শ্যাওলা রং এর গয়না । ভারি সুন্দর লাগছে ওকে । তার মধ্যে গালে টোল ফেলে হেসে বলে -- বাবা তো তুমি ইচ্ছে করলেই হতে পারো ।

চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বেশ উঁচু গলায় বলে ওঠে হিমল --- সেটা কীভাবে ?

লাজুক হেসে বলে জুন --- একটা বৌ জোটাও , রোমান্স করো --ফট্ করে বাবা হয়ে যাবে ।

হিমল হাসে না । ওর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় ।

ওর কাছে প্রেম মানে আগেই লাভ মেকিং আসেনা ।

ও নিজে এত শরীর নিয়ে মাতামাতি করেছে ,যদিও অন্যভাবে -তাই হয়ত দেহের বাইরে যে সত্ত্বা আছে তাকে এখন বেশি গুরুত্ব দিতে চায় ।

ভালোবাসা থাকে হৃদয়ে । বৃষ্টিভেজা কৃষ্ণচূড়ার মতন সিঁদুর রাঙা যোনি পথে কিংবা ঘন অরণ্যে গম্বুজের মতন জেগে ওঠা পুরুষাঙ্গে নয় ।

এসব চিন্তাধারার জন্য বোধহয় ওর কলিগেরা ব্যঙ্গ করে বলতো : হিমি, হিমি , হিমি আমাদের মনে হয় তোমার মতন বীরপুরুষের জন্য আমরা কোনো পাত্রী খুঁজে পাবোনা এই আর্থ প্ল্যানেটে । তাই তুমি বাপু কোনো সেলেসিয়াল বিং এর সাথে প্রেম ও মৈথুন শুরু করো ।

এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে পশ্চিমী তান্ত্রিক অনেক সংস্থা, যারা তন্ত্রের শুদ্ধ তত্ত্বগুলিকে বিকৃত করে যে সমস্ত প্রাচ্যের ভন্ড গুরু বাজারে ছেড়েছে তাদের কাছ থেকে এইসব শিখে নিয়ে লোককে ভুল পথে চালায় । দেখবে তোমার জন্য ই-টিরা হয়ত গড়ে তুলবে কোনো খাজুরাহো । ওদের মিথুন মূর্তি নির্ঘাত শুধু স্পর্শ আর প্লেজেন্ট থট্স দিয়ে সৃষ্টি করা হয় ।

নো সেক্স -নো ইরোটিকা- নো ভালগারিটি !

অনলি মাইন্ড অ্যান্ড লাইফ এনার্জি ।

রসিকলাল নামে এক ব্যাক্তি এই দ্বীপের সরকারি গার্বেজ কালেক্টার । সেই নিয়ে আসে ময়লার বিন জুনিরার কাছে । জুনিরা কিছু কিছু কিনে নেয় । কিছু এমনিই পায় । রিসাইকেল করার জন্য সরকারি দপ্তর কিছু গার্বেজ রসিকলালের কাছ থেকে নিয়ে যায় । সেগুলি অন্যত্র ব্যবহৃত হয় । রসিকলাল সরকারের তরফ থেকে মাইনে পায় যথারীতি । কিছু গার্বেজ বিক্রি করে জুন এর কাছে । সেই টাকা দিয়ে বেদম মদ খায় । লোকটার কেউ নেই । বৌ মরে গেছে । ছোট থেকেই এই এলাকায় বেড়ে উঠেছে । সন্ধ্যেবেলা বাড়ির উঠোনে বসে খোলা গলায় ভজন গায় । বেশির ভাগই সিয়ারামের কিংবা রাধাকৃষ্ণের গান । একই গান রোজ গায় । বোর হয়না । লোকটার মনটা ভালো । সন্ধ্যায় মদ গিলে গান গাইতে বসে । যতক্ষণ না ঢুলে পড়ছে মদের নেশায় ততক্ষণ চলে ঐ উত্তাল প্রাইভেট ভজন পার্টি । ঐ বেসুরো গান শুনে শুনে শ্রীকৃষ্ণও হয়ত এতদিনে কালা হয়ে গেছেন , কর্ণকুহর ফেটে টেটে একেবারে ।

কৃষ্ণ---মানে দেবতা কৃষ্ণ তো রং এর দিক দিয়ে কালা ; এখন কানহাইয়ার কান আর হাই নেই, লো হয়ে গেছে -মানে উনি কালা হয়ে গেছেন --- এসব ভেবে মনে মনে হাসে জুনিরা । হলুদ মেয়ে, সোনালী যুবতী । গালে টোল ফেলে হাসে । সর্বদাই ।

যাদের গালে টোল পড়ে, তারা নাকি মিচ্‌কে শয়তান হয় । একসময় শুনেছিলো হিমল । তবে প্রিয় বান্ধবী জুন যাকে ও আদর করে ডাকে ঠাকুরী ভট্টরাই (কারণ এই দুষ্টে, নেপালি মানুষের পদবী বলে ও মজা করে জুনিরাকে- এই আজব নামে সম্বোধন করে) ; যে ওকে বাবা হবার সহজ ফর্মূলা চট্‌পট্‌ বাত্‌লে দিলো, আজ স্বর্ণালী সন্ধ্যায় -তার কোনো

শয়তানি এখনও অবধি হিমলের চোখে পড়েনি । ঐ কামাক্ষীর ফেলে দেবার ব্যাপারটা সাপোর্ট করা ব্যাতীত । তবে ওটা শয়তানি তো নয় একটু বেশি বাস্তববাদী হবার ফল । কম সেন্সিটিভ । কম কম নারী । বেশি বেশি মেশিন মানুষ ।

রসিকলাল তবে রসিক বটে ! এই লখিমগড়ের এক বাল বিধবাকে নাকি শাদী করতে চেয়েছিলো । সমাজ সেবার জন্য । সেই বিধবা মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার আগেই অবশ্যি বেচারি ইহলোক ত্যাগ করে বৈধব্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ।

ভাইয়ের সংসারে ছিলো । তার বৌ আর বাচ্চাসহ এক ঘরে । পরে বারান্দায় শুতো । শীত-বর্ষায় । জংলী জানোয়ারের ভয়ে একটা বড় প্যাকিং বাক্সে ঢুকে শুতো । তারপর একদিন ঐ বাক্সেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । ওকে নাকি ওর ভাই ও তার বৌ সমুদ্রের নোনা জলে ভাসিয়ে দেয় । পোড়ায় না ।

এই নারী যার নাম ছিলো পুঁচকি সে আবার প্রায় বোবা মেয়ে । সাতশো চড়েও কোনো **রা** কাড়ে না । চুপচাপ কাজ করতো আর লুকিয়ে কান্নাকাটি করতো । এরকম স্তব্ধ মেয়ে শেষ হয়ে গেলো নীরবে ।

পুঁচকি রবে নীরবে , রসিকের হৃদয় কুটিরে- পূর্ণিমা নিশিথিনী সম ।

রসিকলাল নাকি শুনে কেঁদে ছিলো । আর জুনিরার সামনেও কেঁদেছিলো । ধুতির কোণা দিয়ে চোখ মুছে যাচ্ছিলো ক্রমাগত । হয়ত বিয়ের প্রস্তাব দেবার সুযোগ হয়নি , কে জানে !! জুনিরাকে তো বললো :::: দিদিভাই আমার বৌয়ের সেরকম দরকার নেই । নিজে রেঁধে খাই ও আরাম করি ।

খেটে খাই । সারাদিন খাটি বলে রাতে এমনিই ঘুমে এসে যায় । অন্যকিছু করার ও ভাবার অবকাশ হয়না । কিন্তু পুঁচকির করুণ অবস্থা দেখে দেখে খুব কষ্ট হত । তাই ভাবলাম ওকে বিয়েই করে ফেলি না কেন ! পুঁচকির ভালো গানের গলা ছিলো । একবার না পুকুর পাড়ে রামো রতনও ধন পায়ো গাইছিলো । খুব মিষ্টি ছিলো গলার আওয়াজ । সত্যি বলছি । তবে ও একটু লাজুক ।

রসিকলাল ওরফে রসি একটা রুগ্ন ঘোড়ার গাড়ি করে মালপত্র নিয়ে আসে । ওটাকে নিজের ঘরের বাইরে বেঁধে রেখে ঘুমাতে যায় । ঘোড়াটা খুব রোগা । হাড্ডি বেরিয়ে আছে । দেখে মায়া হয় । কিন্তু রসিকলাল খুব গরীব তো তাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা ভাবতেও পারেনা ।

একবার একটি সাদা ধবধবে পাখি পড়ে গিয়েছিলো ময়লার বড় বিনে । সেখানে তন্দুরি মশলার বিরাট একটি অংশ কেউ ফেলে যায় । পাখিটি প্রায় কমলালেবুর রং ধারণ করে । তার গা থেকে নাকি এত্তো সুন্দর গন্ধ

বার হচ্ছিলো তন্দুরির-- যে অনেকেই ভাবছিলো ওকে জবাই করে , তন্দুর চুল্‌হায় পুড়িয়ে খাবে ।

রসিকলাল পাখিটিকে বাঁচায় । ও দরদী । পাখি , পুঁচকি , পোকামাকড় সবাই ওর দরদের আড়ালে বসবাস করে । ঘোড়ার গাড়িটি নিয়ে ও যখন আসে তখন জুনের অনেক সময়ই মনে হয় যে এবার ঘোড়াটি নির্ঘাত এখানে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করবে । কিন্তু প্রতিবারই ওর ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েই রুগ্ন ঘোড়াটি প্রবল বেগে ধাবিত হয় গৃহ অভিমুখে -- পরিত্যক্ত গার্বেজ, লোকালয়ের আবর্জনাটুকু সযত্নে ওর গুদামে ঢেলে ।

রসিকলাল বলে মাঝেমাঝে : জানো দিদিভাই আমি শুনেছি যে আকাশে কোন একটা তারা আছে সেটা খুব উজ্জ্বল । মাসে একবার সেই তারা নাকি খসে পড়ে এই দুনিয়ায় । তখন মাঝরাতে আকাশে কোনো আলো থাকেনা । সেইসময় একটা সাদা ধবধবে , ঠিক দুধের মতন ঘোড়ার গাড়ি আকাশ থেকে নেমে দূরে ধূ ধূ মাঠের দিকে ধেয়ে যায় । যে বা যারা সেই দুধ সাদা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পায় তারা আর গরীব থাকেনা । তাদের কপাল খুলে যায় । তুমি কি দেখেছো গো , সেই ঘোড়ার গাড়িটা কখনো ?

হা হা হা --- খুব হাসে জুনিরা । ভাস্কর ও শিল্পী মানুষ । বলে : এরকম দুধের মতন ঘোড়ার গাড়ি নামে আকাশ থেকে ? তাও মাসে একবার করে ? নাহ্ ! বাপু আমি সেরকম কিছু শুনিনি । এগুলি আজগুবি গপ্পো । তোমার মতন মানুষদের বোকা বানাবার জন্য বানানো হয় । তা সেই গাড়িটি দেখানোর জন্য তোমার কাছ থেকে কেউ টাকা চায়নি ? দক্ষিণা হিসেবে ?

এবার আরো জোরে হাসতে থাকে জুন ।

রসিকলালও হাঁ হাঁ করে ওঠে । চোখ মুখ বেঁকিয়ে বলে : আরে না না ও জাদু ঘোড়া আছে । কে পয়সা চাইবে ? আর আকাশ থেকে তো ইরোপেলেন (এরোপ্লেন) নামে যা আরো অনেক বড় আর ভারী ;পাখির মতন দেখতে গাড়ি একটা । ঘোড়া তো ওর কাছে অনেক হাল্‌কা !

জুনিরা ওকে আশাহত করার চেষ্টা করেনা আর । থাকনা সরল মনের এই স্বপ্নটুকু ওর কাছে জমা । কী দরকার ওকে ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো করে জানানো যে এই স্বপ্ন কখনই সত্যি হয়না , হবেও না ।

তারপর থেকে ও এলেই সেই সাদা দুধ ঘোড়ার কথা একবার না একবার বলতো । জুনিরাও ওকে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করতো ।

বাঙালীদের অভিধানে যেমন দুই জাতের মানুষ আছে , মূর্খ আর পন্ডিত সেরকম এদের কাছে আছে দুই ধরণের মানুষ -আমির আর গরীব ।

কাজেই গরীব রসিকলাল হতে চায় আমির । দোষের তো কিছু নয় ।

সমস্ত মানুষকে অপমান করার প্রবণতা বাঙালীদের মধ্যে বেশ ভালোরকম আছে বলেই শুনেছে বং-স্‌ বন্ধুদের কাছে । নন্‌-বেঙ্গলিরা নাকি সিংহভাগই অসৎ হয় ।

উড়ে, খোট্টা , মাওড়া , আসামী , বাহে (উত্তরবঙ্গীয়) কাঞ্চা এই সমস্ত উপাধীতে অন্যদের ভূষিত করা বং-স্‌ জাতিকে ও রাজ্যকে না এবার কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের সাথে জুড়ে দেন !

শেষমেশ খোট্টার আন্ডারে যেতে হবে কোনোদিন কি ভেবেছিলো উন্নাসিক বাঙালী ?

ওদের জগতে কেবল বাস করে পন্ডিত আর মূর্খ । বিহারীরা এবার হয়ত সেই ধারণা বদলে করে দেবে : আমির আর গরীব ।

বাংলাকে এবার ঢেলে সাজাতে হবে । মগজ থেকে যেতে হবে বাণিজ্যে । কারণ সবাই জানে যে :: **ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় --পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ।**

Love and business and family and religion and art and patriotism are nothing but shadows of words -when a man is starving—O Henry.

খ্যাতনামা বাঙালী কবি, ও-হেনরির থেকে কপি করেছেন নাকি উল্টোটা ?

আজকাল যা যুগ পড়েছে হয়ত প্রতিটি নি:শ্বাস-প্রশ্বাসের এবার থেকে কপিরাইট হবে - বাড়িওয়ালা তার ভাড়াটেকে বলবে:: এই! আমার বাতাসে শ্বাস নিচ্ছেন কেন ? এটা আমার বাবার বাতাস কারণ বাড়িটা আমাদের ----------অকাট্য যুক্তি ।

আসলে বিভিন্ন মানুষ অনেক সময়ই -একই চিন্তা করেন । কাজেই নানান দেশের ধর্মীয় চিন্তা অথবা সাহিত্য , বিজ্ঞানে অনেক মিল থাকে । সবসময় বলা যায়না যে সেগুলি কপি করা বিষয় ।

অনেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন যে উনি পুজো পর্যায়ের রচনা ও দার্শনিক লেখাগুলি বহু আগের, বহু সাধক ও ধর্মগুরুর

চিন্তাধারা থেকে ধার নিয়ে করেছেন । যেমন কবীরের দোহা পড়ে অনেক কবিতা লিখেছেন ।

কবিগুরু নিজে বড় সাধক নন । কাজেই ইন্‌ফাইনাইট্‌ কে জানতে হলে তাঁকে সাধকদের এক্সপিরিয়েন্সের ওপরেই নির্ভর করতে হবে । এতে কপি করার ইস্যু কোথার থেকে আসছে আল্লাহ্‌ থুড়ি ঈশ্বর জানেন । আজকাল তো এরাও সবাই ভিন্ন ।

আল্লাহ্‌ ডাকলে হয়ত গড কপিরাইটের জন্য পয়সা চাইবেন ।

--আমার নামে ওকে ডাকছো কেন ?

আসলে এগুলি হল অতিরিক্ত এন-জি-ও হবার ফল । ইস্যু তো চাই একটা , যা নিয়ে ধনীদের পত্নীরা লড়াই করে সময় কাটাবে !

তারপর আছে সেলিব্রিটিদের পেছনে লাগা !

লতা কেন কাঁদবেন ? এটা উনি মীনাকুমারী মানে ট্র্যাজেডি কুইনের থেকে কপি করছেন । ফ্রি-তে কাঁদার অধিকার ঈশ্বর/গড/আল্লাহ্‌ যিনিই হোন্‌ , কেবল দূর্বলদের দিয়েছেন । লতাজীকে কান্নার জন্য, কপিরাইট হিসেবে অর্থ দিতে হবে । উনি গান আর কী গেয়েছেন ? আমাদের পাড়ার হাবুর দাদু -বহু আগে থেকেই গলা কাঁপিয়ে দেখাচ্ছেন ! এই গান মানে গলার কম্পন তো লতাজী ওঁর থেকে কপি করেছেন !

শচীন তেন্দেলা কেন সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছেন ?

- উনি এত ধূলোবালি ঘাটেন , ওঁকে তো হাত সাফ করতেই হবে ! এরকম বললে শুনতে পাবেন যে দুনিয়ার প্রথম সাবান যিনি

আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর বংশধরদের খুঁজে বার করে তেন্দেলাকে পয়সা মানে ডলার দিতে হবে ।

- কেন ? কারণ উনি মহা বড়লোক । পয়সা ওঁর, সৎ উপায়েই তো উপার্জন করা-তবুও আমার কেন গায়ে জ্বালা ধরে বুঝিনা ।

(গরীবদের থেকে ধনীদের সমস্যা আরো বেশি । গরীব মানুষ শুধু পয়সা কামানোর কথা ভাবেন । আর ধনীদের, সেইসঙ্গে টাকাপয়সা ধরে রাখার কথাও ভাবতে হয় ।)

কাজেই এবার পিছিয়ে পড়া , ভাবুক বাঙালীদের কবিতা থেকে কল সেন্টারে , মৎস্য থেকে ছাতু-তে যেতে হবে । রসগোল্লা থেকে ঠেকুয়াতে আর বাঙালী থেকে খোটুয়াতে যেতে হবে ।

এতখানি কি সইতে পারবে বাঙালী ? একে তো একটি প্রগ্রেসিভ স্টেটকে কমিউনিজম্ দিয়ে পথে বসিয়েছে নেতারা । সেই ঠ্যালা সামলাতে রাজ্যবাসী আজ দলে দলে অন্যপ্রদেশে গিয়ে থিতু হবার চেষ্টা করছে । স্বজন-পরিজন, ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে, নখদন্ত বার করে অস্তিত্বের লড়াই -- সহজ নয় । তারপর বিহারী রোষে পড়লে কী হবে ?

এতদিন খোট্টা বলে টলে হেসেছে । এখন বিহারী মানুষ শুধু হাসবেই না, শোধ তুলতে যদি **গাপ্পু যাদব ওরফে গ্যাপস্ ,** কয়েকশো গোমাতাকে নিয়ে এসে বলে :: বোংগালি বাবুমসাই -গোলগোল করে কথা বলা মান্হুশ -এইসব বলদের দেখভাল করে এখানে দিন কাটাতে হবে । আর হিন্দী বলতে হবে ।

আসবেন মারাঠিরা । মার্‌হাঠী মান্‌হুশ । বাজী রাও হয়ে বাঙালীকে অশ্বে চড়ে ছুটতে হবে । ভেতোর, বেতো শরীরের কী অবস্থা হবে তখন ? মগজে পড়বে ডান্ডা ।

অনেক বাঙালীর প্রশ্ন যে মারাঠী মানুষের ডেলিকেসি একটি আজব খাদ্য । পাউভাজি । পাউরুটি যখন ছিলো না তখন এই মান আর হুঁশেরা কী ভক্ষণ করতেন ? আর এখন ওদের নেতারা লম্বা লম্বা দিচ্ছেন কিন্তু একটা সময় বর্গী হয়ে বাংলার সতেজ ধান আর অন্যান্য ফসল কেড়ে আনতো এরাই । সেগুলি কী কোনো মারাঠী নেতারা জানেন না ?

কাজেই ওরা এলেও কোনো না কোনো পোর্টফোলিও আনবেন সাথে । স্পেশালি ডিজাইনড্‌ ফর বং-স ।

ওদিক থেকে আসবে ধাই গিরি গিরি, এদিক থেকে ধেয়ে আসবে গাদা গাদা অহমের অহং মানে শব্দ : মই আপোনাকে ভালো পাউ (ভড়া পাউ না কিন্তু) অর্থাৎ ভালোবাসি । (মানে অহমিয়া হাগিং -----) এইসব বলে জাপটে ধরছে আসামিরা মানে অহমের মানুষ । ভাবা যায় ? একজন বাঙালীকে নাকি জড়িয়ে ধরছে এক অহমিয়া মানুষ ? দিনকাল সব পাল্টাইয়া গেসে ---

আর পাইয়া তো আছেই !

বাঙালীর কাছে পাঞ্জাবী মানেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সিংজী !

দক্ষিণী মানে মাদ্রাজী --- কপালে জেব্রা ক্রসিং আঁকা মানুষ ।

--আইও ! আম তো বেজিটেরিয়ান আঁয় জী ।

এবার তো বেজিটেরিয়ান খেয়ে থাকতে হবে । মছলি বন্ধ্ ।

গোবির পোকা বেছে দেবে বাঙালী । নাহলে ওটা নন ভেজ হয়ে যাবে ।

তারপর পশ্চিম থেকে লক্ষ লক্ষ গুজ্জু ভাইরা তেড়ে আসবে ।

--কেম ছে , কেম ছে ---করতে করতে ।

বাংলাটা এখনও গুজরাট হয়ে যায়নি--গান গেয়েই শুধু স্বস্তি পেলে হবেনা বরং গুজ্জুরা সবাই চলে আসছে এখানে ---এবার বাংলা সত্যি সত্যিই গুজরাট হয়ে যাবে ! ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হলে অবশ্যই মঙ্গল ।

বিপ্লবী বাঙালী এবার কী করে, উঠে দাঁড়ায় নাকি নুইয়ে পড়ে সেটাই দেখতে চায় জুনিরা , ঠাকুরী ভট্টরাই । আবর্জনা দিয়ে রূপকথা লেখা যার কাজ !

---কাঞ্চী রে কাঞ্চী রে, জুনিরাকে দেখে ছড়া কাটে-- অলস কিন্তু এক একটি মাইক্রফট্ হোমস্ , সাহসী, রুচিবান বাঙালী । আজও । এই অবস্থাতেও, এই বাংলায় । যেখানে অটোওয়ালা থেকে বাবু থেকে চাক্রা অবধি , **থব্বাই ইন্তেলেক্তুয়াল !**

যেই সময় লোকে ক্রিটিসাইজ করে কাটায়, সেই সময় অন্য বর্ণ , ধর্ম , জাতের ভালো জিনিসগুলি শিখে নিলে সুবিধে হবে -এটা জুনিরার ধারণা ।

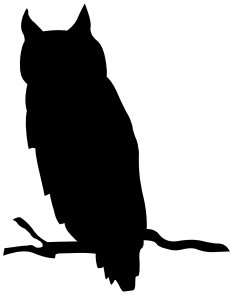

ওর এক রাজস্থানী ব্যবসাদার ক্লায়েন্ট, ওকে দিয়ে কেবল সুন্দর সুন্দর প্যাঁচার মূর্তি কিংবা অবয়ব বানাতো । বেশিরভাগই পিগ্‌মী প্যাঁচা ।

এই ক্ষুদ্র প্যাঁচা নাকি ওর কাছে খুব আর্টিস্টিক । তাই লোকে যেমন গনেশ কালেক্ট করে সেরকম এই মানুষটি অসংখ্য প্যাঁচার অবয়ব জুটিয়ে একটি প্রাইভেট মিউজিয়াম করেছে, নিজের বাসায় । হাতের তালুর ওপরে বসে পিগমি প্যাঁচা ।

জুনিরাকে, ক্যাপসিকামের ভেতরে ঘরে তৈরি মাখনের-পুরু ভাগ দিয়ে কীভাবে পাকোড়া বানাতে হয় সেটা শেখায় । ভেজে দেখায় ।

অনেক টাকা দিতো ওকে । দরাদরি করতো না । ওদের শিল্পী মহলে একটা কথা আছে সেটা হল যে যেমন ঘি দেবে সেরকম বিরিয়ানি হবে । মানে যত অর্থ ঢালবে তত ভালো মূর্তি তৈরি হবে ।

আজকাল তো সংবেদনশীল মানুষও ডলারের পায়েস খান । ওর অনেক ক্রেতা বলে : শুধু মাটির তাল আর ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তো মূর্তি বানান , তার এত চার্জ ? বেসিক্যালি এদের তো কোনো মূল্যই নেই ।

জুন মিষ্টি হেসে বলেঃ ফেলা দেওয়া জিনিস দিয়েই হোক্ আর নতুন জিনিস দিয়েই হোক্ একটা আর্ট ফর্ম তো তৈরি হচ্ছে । তা আপনি নিজে করে ফেলুন আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন কেন ?

কারণ আপনি সেটা পারবেন না । আর যেই টেকনিক্ এর জন্য এই রূপ আপনি দেখতে পাবেন, চার্জ সেইজন্য করা হয় ।

হতদরিদ্র মুখোশ বিহীন রসিকলাল যেই লাঠিটা দিয়ে ময়লা খুঁচিয়ে সোনা বার করে তাকে ও বলে ওর যন্ত্র । দুবার- হ্যাঁ, দু- দুবার ও দামি জিনিস খুঁজে পেয়েছিলো ময়লার গাদায় । কিন্তু ওর কোনো পরিচিত সরকারি মাতব্বরকে দিয়ে দেয় । সততার জন্য তাই পুরস্কার পেয়েছিলো একবার । যেহেতু ও গরীব তাই ওকে টাকা দেওয়া হয়েছিলো পুরস্কার হিসেবে । মেডেল ফেডেল নয় । মেডেল তো সেই বেচেই খাবে !

কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে, গার্বেজ হাতে পেয়েও ও তাতে সঞ্চার করতে পারেনা প্রাণ -স্বর্গীয় বিভা। সেখানেই জয়, ঠাকুরী ভট্টরাই-য়ের। তাই হিমলের ওকে এত ভালোলাগে ।

পশ্চিমী দেশ যেমন শেখায় সব কিছু বাজিয়ে দেখে নেবে। প্রশ্ন করবে। তাই কেউ কেউ সব কিছুতেই প্রশ্ন করতে শুরু করে।

--ওটা একটা ছাগল, এটা বললে প্রশ্নকর্তা বলে বসবে : কেন ? হোয়াই।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন না করে সরল বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে হয়।

তাই বোধহয় হিমল, জুনকে বিশ্বাস করে। প্রিয় বান্ধবী মনে করে।

ওর হিমঝরা মনে উষ্ণতার স্পর্শ দেয় এই সরল বিশ্বাস।

কমান্ডোরা খুবই স্পেশাল জাতের বীর। আর তাদের কাছে হেরে যাওয়া বলে কিছু নেই। হয় জয় অথবা মৃত্যু। কিন্তু সিংহভাগ ক্ষেত্রে ওরা জয়ের দিকেই যায়। মৃত্যু মানে পরাজয়-- ওদের রাজটিকা হয়না।

এক আর্মি অফিসারকে চেনে যার মা অত্যন্ত চিন্তিত ছেলে যুদ্ধে মারা যাবে কিনা তাই নিয়ে। হিমলের বলতে ইচ্ছে করে যে এতই যখন আপনার ছেলের প্রাণ নিয়ে অবসেশান তখন তাকে আর্মিতে দিয়েছেন কেন ? শো অফ্ করার জন্য যে একজন ম্যাচো ম্যান আপনার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে ? যোদ্ধাদের বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের মৃত্যুতে গর্বিত

হয়, রাজপুতদের মতন । আপনার মতন আঁচলে বেঁধে রাখেনা তারা, তাদের বাচ্চাদের । যোদ্ধারা আছে বলেই আপনি সুখে আছেন ।

যুদ্ধ কী আর সেও চায় ? কিন্তু এটা কঠোর বাস্তব । শয়তানের শয়তানি রুখতেই বেশি যুদ্ধ হয় । হিমলের মতে, যারা দেশের জন্য, দশের জন্য প্রাণ দিতে আসে তাদের কাছে সেটাই গর্বের বিষয় । বীরের মৃত্যু । তারা যুদ্ধে গিয়ে --মায়ের জন্য লড়াই করবে না এই অ্যাটিটিউড্ নিয়ে লাইন অফ্ ফায়ারে অবগাহন করলে তাতে দেশবাসীর ক্ষতিই হবে । কাজেই ওর মনে হয় এই নেকিয়ে কথা বলা , ৬০ বছরের ইমোশনাল মায়ের **ভীতু অফিসার ছানা** , অফিসে বসে খাতা লিখুক । বীরযোদ্ধার ভূমিকায় না গিয়ে ।

সেজন্যই হয়ত চেতকের মতন তেজী ঘোড়ারা যাকে তাকে মণিব বলে স্বীকার করতো না । তার জন্য রাণা প্রতাপ হতে হত !

রাণা প্রতাপের মা গর্ব বোধ করেন ,সন্তানের হল্দিঘাট যুদ্ধের জন্য !

প্রশ্ন করেন না জগৎবাসীকে -- দুদ্ধ তেনো ? থপ্ দুদ্ধ তেনো বন্দ হবেনা ? ওদিকেও তো একতা মা আথে । ও-ও মা আমিও মা । তপাৎ খালি, ও দোদ্ধার মা আল আমি ন্যাকা মা । থপ্ দুদ্ধ এখ্খুনি বন্দ কলো নাহলে আমি ভ্যাঁ কলে কেঁদে ফেলবো !

বিদেশের অনেক দেশে, সমস্ত মানুষকে (ছেলে ও এখন মেয়েও) কয়েক বছর আর্মিতে কাজ করতে হয় যাতে যুদ্ধ শুরু হলে তারা দেশের কাজে নামতে পারে ।

সারাটা জগতের ইগো কি এইভাবে নেকিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে ?

বহু মানুষের কাছে হাম্বেলনেস্ খুব ভালো গুণ আবার অন্য মানুষের কাছে সেটা এক ধরণের দূর্বলতা । কারো কাছে যুদ্ধে মৃত্যু বীরের মতন কাজ আবার কেউ কেউ যুদ্ধ থেকে পালাতে চায় -ওয়ার ফোবিক। কেউ সৌদি রয়াল ফ্যামিলির উপাসক কেউবা পছন্দ করে কমিউনিজম্ । কেউ মগজ খাটিয়ে খেতে ভালোবাসে কেউ বা সেক্সকে জীবিকা করেই আনন্দ পায় । তাদের সবাই, জোর করে ধরে আনা দেহপসারিনী নয় । কেউ নারীদের সৌন্দর্য্যের উপাসক কারো কাছে সেটা চটুলতা ।

বিবিধ মানুষ ও তাদের জীবন দর্শন, চিন্তাধারা দিয়ে জগৎ সাজানো । তাই তো দুনিয়া এত সুন্দর । এই ব্যাঁকা-ত্যারা মানব জীবনে যখন ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয় তখনই শুরু হয় যুদ্ধ । কেউ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করেনা ।

এত বড় বড় যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা যে আছেন, যুদ্ধ নিয়ে নানান অ্যাকাডেমিক্স আছে ,সেসব নিয়ে চর্চা হচ্ছে --তারা কেউ জানেন না যে যুদ্ধ করা খারাপ । সমস্ত ডিপ্লোম্যাসি যখন ফেল করে তখনই যুদ্ধ শুরু হয় । আর এটা কেবল পৃথিবীতে নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয় যে নানান গ্রহের মধ্যেও যুদ্ধ হয় : প্ল্যানেটারি ওয়ার । গ্রহ যুদ্ধ ।

যুদ্ধ হয় দেবতাদের সাথে দানবদের ।

এই মহিলার ল্যাজে পাড়া পড়লে সে নিজে যুদ্ধ থেকে কী উপায়ে বিরত থাকে সেটা হিমলের একটি জানার বিষয় ।

আর আমাদের দেহের ভেতরেই তো সবসময় যুদ্ধ চলছে । শ্বেতকণিকা নানান জীবানু ইত্যাদিকে আক্রমণ করে যাচ্ছে । টিউমারকে যতক্ষণ শরীর, মেরে কন্ট্রোলে রাখছে ততক্ষণ ক্যান্সার হচ্ছে না ।

তবেই দিনশেষে ,আমরা ন্যাকাবার সুযোগ পাচ্ছি । নাহলে হাসপাতালে গিয়ে মুখে অক্সিজেন মাস্ক পড়ে শুয়ে থাকতে হত ।

এটা দেহ-যুদ্ধ । যেহেতু নিজের প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে তাই --এতা দুদ্ধ না- এততে তো তপার লাইপ বাঁতে । বলা হয় ।

আদতে এও এক যুদ্ধ । আর প্রতিটি দম্পতিই জানেন গৃহযুদ্ধ কী বস্তু ।

যেখানে ইগো আছে সেখানেই যুদ্ধ হবে । বহির জগতে ম্যানিফেস্ট করলেও এই ওয়ার আসলে ইগোর যুদ্ধ ।

ভগবান তথাগত , মহাবীরের মতন শান্তির দূত -যুদ্ধ থামাতে পারেন নি আর অন্য কেউ কী করবে ?

ন্যায় আর অন্যায়ের দোলায় দুলছে জীবজগৎ । যা মন্দ তা মন্দই- সে কোনো নোবেল লরিয়েট করলেও মন্দ আর যা ভালো তা ঘেয়ো, দলিত কোনো মানব সন্তান করলেও তা ভালোই ।

একটা আর্টিকেল আছে ::: ***Nobel Laureates Who Were Not Always Noble-- Racists, frauds, and misogynists: Meet the rogues gallery of Nobel Prize winners.***

সেই লেখার কথা আমরা বেশি জানিনা । কিন্তু কোনো দলিত, ভুল করেও যদি কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে তাই নিয়ে ঢিঢি পড়ে যায় । তাই না ? দ্বিচারিতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় , কোষে কোষে ।

ইরা, লজিস্টিক কোম্পানিতে কাজ করতো ভারতের এক শহরে । কোম্পানির কাজ হল, পুরনো শিপিং-কন্টেনার নিয়ে তাই দিয়ে ক্রেতাদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া । যারা বাড়ি কিনতে অক্ষম, সেইসব মানুষেরা অত্যন্ত সস্তায় এইসব রেডিমেড বাড়ি কিনে তাতে বসবাস করতে সক্ষম । বাক্স-বাড়িগুলিতে অল্প জায়গা হলেও তা ইকোনমিক উপায়ে ব্যবহার করে, সুন্দর সুসজ্জিত একটি বাসস্থানে রূপান্তরিত করা ছিলো ওদের কোম্পানি **নেস্টের** কাজ । করিৎকর্মা ইরা, যার পুরো নাম ইরাবতী (জন্ম পাঞ্জাবে , বাবা কাজ করতেন ডিফেন্সে বলে) নিজ দক্ষতায় খুব তাড়াতাড়ি মণিবের নেকনজরে পড়ে যায় । ও বাবার কর্মসুত্রে সারা ভারত ঘুরেছে । থেকেছে নানান জায়গায় । বাংলাতেও ।

তাই অনেক প্রেজুডিস্ থেকেই মুক্ত ।

ও এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছে তাই ওকে দিয়ে মণিব মানে শিরিষ সিন্হা অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ করাতো । শিরিষ বিবাহিত । ঘোরতর সংসারী । দুই মেয়ে ও এক ছেলে । কুহু , কলি আর কিন্নর তিন সন্তানের নাম । ইরাকে ওরা পিসি বলে। কুহু হল ইরার সবচেয়ে কাছের । খুব ন্যাওটা ওর । কুহুর মুড ভালো থাকলে ও ইরাকে দুটি গল্প বারবার শোনায় ।

একটি গোয়েন্দা গল্প পড়ছিলো কুহু । খুবই উৎসাহ নিয়ে । মজার ব্যাপার হল যে -কে খুনী জানতে গিয়ে যখন শেষ অঙ্কে পৌঁছেছে তখন দেখলো খুনী আসলে লেখক নিজেই । কারণ পুরো গল্পটা ওঁরই সৃষ্টি । কাজেই খুনগুলি নিজেই সৃষ্টি করে নানান চরিত্রদের দিয়ে করাচ্ছেন । কুহুর জিজ্ঞাস্য ছিলো এই যে একে কি গোয়েন্দা গল্প বলা যায় ?

দ্বিতীয় গল্পটা হল এই যে একটি কিশোরের এক পোষা বিড়াল ছিলো । একদিন সে মারা যায় । নাম তার ছিলো মিউসোনা । মৃত্যুর পরে মিউসোনা নিয়মিত কিশোরটির কাছে আসতো স্পিরিট হয়ে ।

আত্মারা তো নানান আকৃতি, রূপ ইত্যাদি ধারণ করতে পারে । কাজেই মিউসোনাকে দিয়ে সেই কিশোর নিত্যনতুন আকার ধারণ করিয়ে মজা দেখতো । যেমন শীতের রাতে ওকে ফায়ারপ্লেস করে আগুনের তাপ নিতো সেই কিশোর । এইভাবে নানান বস্তুতে বিড়ালকে সরি বিড়ালের আত্মাকে রূপান্তরিত করে একদিন মজা দেখার জন্য ওকে বাঘ হতে অনুরোধ করে । সেই ক্ষুদ্র বিড়ালের আত্মা, মালিকের অনুরোধে বাঘ হয়েই ওকে গপ্ করে গিলে খেয়ে ফেললো । কুকুর হলে হয়ত খেতো না!

আত্মারা কি খাদ্য হজম করে ? কিশোরটির কী হল ? এটা ছিলো কুহুর প্রশ্ন ।

শিরিষ সিন্হা আবার ঘোরতর আস্তিক । পুজোপাঠ নিয়ে থাকে । বাড়িতে কৃষ্ণের উৎসব হয় । কান্হাইয়া বলে ওরা । কষ্টিপাথরের মূর্তি ,হাতে সোনার বাঁশি । চকচকে দুটি চোখে হীরের পরশ বলেই হয়ত উজ্জ্বল মণি -পুরো কালো দেহে । এছাড়া চূণী , পান্না আর পোখরাজের সজ্জায়

সজ্জিত কৃষণ্ কানহাইয়া । কালা ; কদমতলায় নয় গৃহেই আছেন রসেবশে । বিরাট উৎসব যখন হয় ওদের বাড়িতে তখন শহরের নামীদামী মানুষও আসেন একটিবার । আসেন ঘোরতর নাস্তিকেরাও । ভোগের প্রসাদ খেতে । অসাধারণ সেই নিরামিষ ভোগ , সবজি , পায়েস । সবজিগুলো ওদের নিজেদের ফার্মেই তৈরি হয় । ফার্মহাউজ আছে নদীয়ার দিকে । সেখানে কান্হাইয়ার আরো একটি মন্দির আছে । তার পাশেই বসবাস করে হরিণ আর হরিণী সঙ্গে ময়ূর আর ময়ূরী । পোষা অবশ্যই । সাদা ময়ূরও দেখা যায় ।

ইরা এই পরিবারের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে । শিরিষের স্ত্রী ঊর্মিলা নিজেও ইরাকে খুবই ভালোবাসে । ও ঊর্মিলাকে তো বৌঠান বলে । সুন্দরী ঊর্মিলার এক মাথা চুল । সেই হাঁটু সমান চকচকে চুল খুলে শীতের দুপুরে রোদ পোহায় ঊর্মিলা, বাড়ির বারান্দার । দু -একটি চুল হয়ত উড়ে চলে যায় খেয়ালি বাতাসে ।

সেই চুল , বাতাস থেকে পেড়ে এনে জমিয়ে রাখে ইরা ।

আদরের বৌঠানের চুল । শর্টকার্টের যুগে বৌঠান অবশ্যি হয়ে গেছে বোঠান আর তার থেকে বো ।

ইরার বো, ইরাকে নিজের ছোটবোনের মতই ভালোবাসে । এস এম এস আসে দুরন্ত সাঁঝে --- কাল মোগলাই পরোটা করছি , খেয়ে যাস্ ।

অমুকদিন বানাচ্ছি ইলিশ আনা (ইলিশ মাছ আনারস দিয়ে) অবশ্যই আসবি । পরশু কলির জন্মদিন জানিস্ তো । আসা চাই । পরে ফোন করবো তোকে ।

তমুক দিন আমি ভাবছিলাম প্রণ বিরিয়ানি বানাবো । খাবি তো নাকি মালাইকারিটা করবো আবার ? তেল কৈ সামনের মাসে হবে । কচি পাঁঠার সিমলা মরিচ আর মাশরুম দিয়ে ঝোল ? আসছে পরেই !

ইরা আপ্লুত । খুব ভালোবাসে ওদেরকে । আসলে অফিসের সবাই বাসে । ওরা এক পরিবারের মতন । কারো অসুখ বিসুখ হলে মালিক তার বাড়ি হানা দেয় -সবান্ধবে । শ্রমিকদের সঙ্গে বসে, ওদের অফিসে ম্যানেজারেরা খায় । আলাপ প্রলাপ চলে । তাদের অসুখ হলে, শিরিষ নিজে যায় ওদের বাসায় । কী করলে দেহে বল আসবে আর কাজে ফিরতে পারবে সুস্থ সবল হয়ে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসে । শিরিষ বর্ন লিডার । সবাই ওকে ফলো করে । খুবই ভদ্র -- পাকা জেন্টেলম্যান । দরদী । কিন্তু কাজে এমনি এমনি ফাঁকি দিলে এই মানুষই হয়ে ওঠে কড়া । বলে --কোম্পানিতে আমার একটাই প্রবলেম । আমি নিজে ফাঁকি দিতে পারিনা । মালিক বলে ।।

নটোরিয়াস মাইক্রো ম্যানেজার । তবে সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে , ভালোবাসে । কারণ কর্মীরা জানে ও রেগে যদি যায়ও সেটা কর্মী ও কোম্পানির মঙ্গলের জন্য । নিজের ইগোর কারণে নয় । অনেক ক্রেতাকে ও খুব কম সুদে কন্টেনার বিক্রি করে অনেক ব্যবসায়ীর চক্ষুশূল হয়েছিলো । কিন্তু ও বলে যে ব্যবসা করতে নেমেছি কাজেই টাকা আর প্রফিট আমার একটা উদ্দেশ্য হলেও আসল উদ্দেশ্য গৃহহীন মানুষের

ছাদের ব্যবস্থা । কাজেই টাকার দরকার আমার থেকেও যাদের বেশি আমি তাদের জন্য কাজ করি ।

অনেকে গালি দেয় --- ব্যবসা না করে এন জি ও খুলে সমাজসেবা করুক । শিরিষ গায়ে মাখে না । ব্যবসাদারের আড়ালে ওর অন্য যেই মুখটা আছে সেটা একটা রক্তমাংসের মানুষের মুখ । তার স্নেহ আছে তিন সন্তানের জন্য । শ্রমিক আর অন্যান্য কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য । কাজেই তিক্ততাকে আঁকড়ে ধরে নিজের সর্বনাশ করতে চায়না । রাগ , হিংসা আর লোভের থেকে বড় টক্সিন আর কিছু নেই । টাকাপয়সা একটু কম থাকলেও ক্ষতি নেই --হৃদয়টা ইস্ত্রি করা , ফিটফাট না হলে জীবন চালানো বড় দায় হয়ে যায় , ওর মতে । কাজে কাজেই ।

ইরা তো বিয়েই করলো না শিরিষের জন্য । দুজনে অফিসের কাজে একসাথে অনেকবার বাইরে গেছে । ঊর্মিলা জানে শিরিষের সাথে গেছে সেক্রেটারি বকলমে সহোদরা ইরাবতী ।

ওকে শিরিষ অনেক দায়িত্ব দিয়েছে তো সেজন্য ।

আদতে গেছে দুটি প্রেম পক্ষী । শিরিষ সবই বোঝে কিন্তু নিরুপায় । বন্ধুরা ইরাকে পাগলিনী বলে । বলে ---আর লোক পেলি না ? বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়লি শেষ অবধি ? ও বৌকে ছাড়বে না কোনোদিন । কী করবি তুই ? নাকি প্যারালাল সংসার রাখবে , বৌ হবি তুই সেখানে ? লিভ ইন রিলেশানে যেতে চায় নাকি ?

ইরা বলে : আমি চাইনা আমার জন্য বোঠানের ঘর ভাঙুক । কিন্তু শিরিষ সিন্‌হা আমার ক্রাশ নয়, পিওর লাভ । আমার কোনো তাড়া নেই । আমি নেক্সট্‌ লাইফের জন্য ওয়েট করতে পারি । এই জন্মে নাহয় রোমান্স করেই কাটিয়ে দেবো ।

এসব গালভরা সমস্ত কথা আওড়ায় নিয়ম করে ইরাবতী । বোঠান ওরফে বো, ওকে ডাকে চন্দ্রভাগা -ইরাবতী বলে । যদি জানতে পারে এইসব গোপন মন কুঠুরির সংলাপ তখন কী করবে কে জানে ! তেল কৈ তখন থৈ থৈ করবে নিমপাতার রসে , হবে নিম কৈ নাকি নিমডাল কৈ ?

একবার ওদের এক জমজমাট পার্টিতে, অফিসের কিছু ফচকে ছেলে যারা ইরার গোপন প্রেমের খবর রাখে তারা বোঠানকে শুধায় : বৌদি , স্যার তো এত দরদী , হ্যান্ডসাম । যদি কোনোদিন রেখা-অমিতাভ কিংবা বনি কাপুর আর শ্রীদেবীর মতন শোনেন শিরিষদার কোনো মেয়ের সাথে কেস চলছে কী করবেন তখন ?

---কিছুক্ষণ থেমে কপট রাগের সাথে বলে ওঠে ঊর্মিলা সিন্‌হা --- মেয়েটির মুন্ডু ভেঙে ফেলে দেবো ।

শুনে অনেকেই ইরার দিকে আড়চোখে তাকায় । ওর এক্সপ্রেশান দেখতে চায় ।

মুখে অবশ্যি বলে : বাব্বা বৌদি, আপনার রাগ তো খুব কম !

একযোগে হেসে ওঠে ওরা । হাতে সুরাপাত্র । নেশা ধরা গলায় গেয়ে ওঠে কেউ সিলসিলার গান : ইয়ে কাঁহা আ গ্যায়ে হাম , তেরে সাথ চলতে চলতে ।

বোঠান কিছু বুঝতে পারেনি । অনেকে বলে বৌয়েরা অনেকটা সারমেয়র মতন । পতিদেবের গায়ের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে অন্য কোনো মেয়ের চক্রে পড়েছে কিনা কিন্তু এখানে বোঠানের সরল বিশ্বাস একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে সবকিছু । অফিসে, ইরা তো শিরিষকে মিটিং-এর সময় লোকসমক্ষে খাইয়ে দেয় । একজন অন্যজনের এঁঠো খায় । শিরিষের পায়ের কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে ইরাবতী । পূর্ণকুম্ভের মতন । যেন এই মোহনায় আছে পুণ্য , অমৃতকুম্ভের মেলা । এখানে চলাচলের শেষ --এখানেই সমস্ত আবেগের ইতি, ইরা তখন শুধুই একটি নদীর নাম !

শান্ত হয়ে বসে থাকে শিরিষও । লোকে দেখেছে , অফিসের লোকেরা । দিনের পর দিন । সাঁঝবাতি ডুব দিয়েছে তবুও দুজনে বসে ।

ঊর্মিলার কাছে এস এম এস যায় : জরুরি মিটিং এ ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আজ আর বাড়ি যাবো না ।

সততার কোনো কম্‌তি নেই যদিও । উর্মিলা জানে যে সাথে আছে ইরাবতী । চন্দ্রভাগা -ইরাবতী ।

ফোনে বলে দেয় : দাদার ওষুধগুলো মনে করিয়ে খাইয়ে দিস্‌ । বিশেষ করে প্রেসার আর আইরন ক্যাপসুলগুলি ।

ওদের নিয়ে অবশ্য কেউ কানাঘুষো করেনা । কারণ সবাই বোঝে যে এটা একটা মৃত সম্পর্ক ।

ইরাবতী অসম্ভব বোকা , গর্দভ আর আবেগ প্রবণ মেয়ে । তাই এই সম্পর্কে জড়িয়েছে । এর কোনো ফিউচার নেই । শিরিষ সিন্‌হা মরে গেলেও বৌ বাচ্চাদের ছাড়বে না । সেটা ইরা খুব ভালো করে জানে তবুও আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে । আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই । সে সরল বিশ্বাসে দাও আর ভুলে ।

ইরার প্রাক্তন প্রেমিক এক রেভেনিউ সার্ভিস অফিসার । কলেজ থেকে প্রেম ছিলো । দৈহিক মিলনও হয়েছে , শুধু মনের মিলন নয় । কিন্তু ছেলেটি মারোয়ার প্রদেশে কাজ করতে গিয়ে এক রাজপুত মেয়েকে বিয়ে করে বসে ।

ইরাকে জানায়ও না । বন্ধুরা অবাক হলে বলে : যেই ইন্ডিয়ান মেয়ে বিয়ের আগে এক পুরুষের সঙ্গে শোয় সে যে আরো লোকের শয্যাসঙ্গিনী হয়নি বা পরেও হবেনা তার কোনো গ্যারান্টি আছে ? কাজেই এর সাথে ফ্লার্ট করা চলে কিন্তু একে বিয়ে করা চলে না ।

বন্ধুরা খুবই আহত হয় । ইরাকে বলেও । ইরা কিছু বলেনা । সবাই ভাবে ইরা একটু বোকা টাইপের মেয়ে । ওকে ব্যবহার করে ফেলে দিয়েছে সেই অফিসার । কেউ কেউ বলেছে যে রেভেনিউ সার্ভিস তো কাজেই রেভেনিউ আদায় করে কেটে পড়েছে ।

কেউ বলে সেজন্যই হয়ত ইরা, শিরিষে মজেছে । কারণ বুঝেছে যে বিবাহিত আর অবিবাহিত পুরুষে বেশি তফাৎ নেই । এদের অন্তরে শুধু রাস্ট আর লাস্ট । লাভ নেই । ছেলেরা, মেয়েদের পছন্দ করে শুধু বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য । কাজ হয়ে গেলে নতুন কুঁড়িতে মজে যায় । এই দুনিয়ার দস্তুর ।

আসলে নানা মুণির নানা মত । ইরা কোনো মন্তব্য করেনা । দোষারোপ করে না কাউকে ।

সেই রেভেনিউ অফিসার ওকে একদিন পাড়ার মোড়ে ধরেছিলো । দীপাবলির আগের রাতে । ভূত চতুর্দশী ছিলো সেদিন । অন্ধকার পথঘাট । ফ্যামিলি রয়েছে মারোয়ার প্রদেশে । ছেলেটি একা এখানে । অযাচিত উপদেশ দেয় ইরাকে । ঘুটঘুটে আঁধারে ওর হাত চেপে ধরে , খপ্ করে । ও চমকে দেখে খুবই পরিচিত স্পর্শ ।

ও কঠিন স্বরে, কর্কশ গলায় বলে উঠেছিলো : ডোন্ট এভার টাচ্ মি ! হাউ ডেয়ার ইউ ?

অনেক যুগ পরে কলেজের পরশ মনে পড়ে যায় । আজ যাই বলুক বন্ধুমহলে, এই ছেলে- ওর বন্ধু ও প্রেমিক ময়ূখ চন্দ , ইরাবতীর দেহলতায় পৌরুষের তাপ দিয়েছিলো এক বর্ষণমুখর রাতে অকস্মাৎ -সে নিজেই ।হঠাৎ হাত ধরে চুমু খেয়ে, চেপে ধরে সেক্স । ওকে রেপও বলা যায় -আর আদালতে গেলে সেটাই বলবেন আইনের মানুষ ।

জোর করে সেক্স করেছিলো । পরে ইরা রিপিট করতে না চাইলে সুইসাইডের হুমকি দেয় । বলে -ওকে দায়ী করে যাবে সুইসাইড নোটে । আর তখন তো ইরা জানতো না যে ময়ূখ চন্দ এক পাকা অভিনেতা । ওকে ঠকাচ্ছে । কাজেই ভেবেছিলো সত্যি সত্যি ভালোবাসে ওকে, তাই এগুলো করছে । বিয়ে তো হবেই একদিন । **Copulate** করা আগে আর পরে এই তো । ওর অ্যাপেটাইটা একটু আগেই বেড়ে গেছে এই আর কি !

কিন্তু ময়ূখ ওকে বিয়ে না করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করলো টাকার লোভে । মেয়েটির নামটা বন্ধু মুখে শুনে খুব হেসেছিলো ইরা ।
অবন্তী বরফিওয়ালা ।

ঠেলাওয়ালা , ফেরিওয়ালা নয় একেবারে বরফিওয়ালা । যাক্ ! অ্যাট লিস্ট ময়ূখ, রোজ গাদা গাদা কাজুর বরফি খেতে পারবে - ফ্রিতে । সেটা ওর অন্যতম প্রিয় মিষ্টান্ন ।

আসলে পরবাসে গিয়েই ,ওর বিয়ে করার কথা শুনে এতই ঘৃণা হয়েছিলো ইরার যে নিজের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায়ে ও পুরোপুরি চাদর ঢেকে দিয়েছিলো । সেই লৌহ চাদর বা কপাট আর কোনোদিনই খোলেনি । ও একা একা কেঁদেছে । কাউকে কিছু বলেনি । কোনো অনুযোগ করেনি । এমনকি ময়ূখের শার্টের অংশও ছিড়তে উদ্যত হয়নি । জাস্ট অ্যাভয়েড করেছিলো ওকে । ওর মতে অ্যাভয়েড করাই বেস্ট শাস্তি । কারণ এইজাতের লোকের একটা প্রবণতা থাকে --যার ক্ষতি করছে তার নাড়ি নক্ষত্রর খবর রাখা ।

দুনিয়ায় আরো অনেক পুরুষ আছে । একজনের মন থেকে সরে যাওয়া অথবা প্রেমের কফিনে পেরেক পোঁতাই শেষ কথা নয় । প্রয়োজনে মেয়েরা একাও বাঁচতে পারে । বিশেষ করে ওর মতন কর্মঠ ও দক্ষ মেয়েরা ।

অনেক মানুষ বলে, বিশেষ করে অফিসের মানুষ যে অসম্ভব ধনবান শিরিষের প্রেয়সী হয়ে ও ময়ূখের মুখে চপটাঘাত করতে চেয়েছে ।

--দেখো , আমিও কম যাইনা । তুমি বরফিওয়ালা হলে আমিও জাহাজওয়ালা ।

ফচকে ছেলের দল বলে : এবার আমরা জাহাজের কন্টেনারে করে বরফি পাঠাবো ! কাকে ? বলো কাকে ! স্যারকে, শিরিষদা কে ।

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে আধুনিক মানুষ-মানুষী । যারা অন্যকে কষ্ট দিয়ে সুখী হয় । অন্যের সর্বনাশ ওদের পিঠে খাওয়ার পৌষ মাস ।

ইরা কিন্তু শিরিষকে সত্যি ভালোবাসে । আর শিরিষ হয়ত বিবাহিত কিন্তু ওকে তো যথেষ্ট যত্ন করে । ডাক-খোঁজ করে । বিয়ের আগে যদি আলাপ না হয় , প্রথম দেখা সময় মতন না হয় তো কেইবা কী করতে পারে ? তার মানে এও তো নয় যে প্রেম হবেনা । আর শিরিষ প্রচন্ড প্রফেশন্যাল ও সিরিয়াস হলেও, প্রেমকে সময় দেয় । জীবনকে সময় দেয়, ইরাকে সময় দেয় । সেটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট । মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ হয় প্রতিটি পদক্ষেপেই । নতুনেরা আসে পুরনোরা হারিয়ে যায় । ষাট বছর বয়সেও আসতে পারে নতুন মানুষ যার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া হয় গোপনে , মনে মনে , একা একা । লোকে পরজন্মের স্বপ্ন দেখে ।

সব যোগাযোগের কি নাম হয় ? সব সম্পর্কের কি শীলমোহরের প্রয়োজন ? কিছু কিছু সম্পর্ক থাকে যা মানুষকে জীবনপথে চলতে অনুপ্রেরণা দেয় । সেই যোগাযোগের রিমঝিম, হৃদয়ের প্রতিটি কোণায় জাঁকিয়ে বসে । আন্দোলিত হয় ঘড়ির পেন্ডুলামের মতন । সুছন্দে ।

কে আর হৃদয় মন্থন করে, এই সম্পর্কের নাম জানতে আগ্রহী ?

শেষকালে জানাজানি হয়ে যায় । বোঠান সব জানতে পেরে যায় । কী করে লিক্ হল সঠিক কেউ জানেনা । আসলে অফিসের সবাই তো জানতো , হয়ত কেউ জানিয়ে দিয়েছে । এখন তো কমিউনিকেশানের অনেক সুবিধে । সবাই মোবাইল ব্যবহার করে । কোনোভাবে কেউ জানিয়ে দিয়েছে আগ বাড়িয়ে, শুভাকাঙ্খী সেজে ।

বৌঠান ভীষণ ভীষণ কেঁদেছিলো । বাচ্চাদের নিয়ে অচেনায় পা বাড়াবার হুমকিও দেয় । অবস্থা এমন হয় যে একমাসের ছুটি নিয়ে শিরিষ সিন্হাকে- সপরিবার , অস্ট্রিয়ার আল্পস্ দেখাতে নিয়ে যেতে হয় । আল্পস্ নাকি অস্ট্রিয়া থেকে বেশি ভালোলাগে । সুইজারল্যান্ডের থেকে ।

তার আগেই বিতাড়িত হত ইরাবতী । বোঠান আর ওর মুখদর্শন করবে না বলে জানায় ।

বোঠান নাকি ডিপ্রেশানে চলে গিয়েছিলো ।

অবশ্যি ইরা এসবের আগেই চাকরি ছেড়ে দেয় ।

ওর বাবা মা তো ধরেই নিয়েছিলেন যে ও আর কোনোদিন বিয়ে করবে না । চাকরি ছাড়ার পরে ওরাও বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন ।

ওর দিদি কোম্পানি সেক্রেটারির কাজ করে **সি-এস** পাশ করে । ওর অফিস মুম্বাইতে তাই বাবা, মাকে নিয়ে দিদি আর ওর বর নিতাইদা থাকে পঞ্চগণিতে । দিদি উইকে একবার আসে বাসায় । বাবা মা থাকেন সবসময় । আর স্বামী নিতাই লোকাল স্কুলের সায়েন্স টিচার । বোর্ডিং স্কুল ।

মুম্বাইয়ের বড়লোকের সন্তানেরা পড়ে সেখানে । ইরা কখনো কখনো যেতো । এখন পাকাপাকিভাবে থাকে । জামাইবাবু বলে : তুই আমার স্কুলে কাজ নিতে পারিস্ । বুক কিপিং পড়াবি ।

ইরা এখনই কোনো কাজে ঢুকতে চায়না । তাই মজা করে বলে : নিতাইদা, আমাকে পুষতে চাওনা তুমি তাই ঘাড়ে ধাক্কা মেরে আবার চাকরি করতে পাঠাচ্ছো । আরে আমাকে একটুও ব্রেক নিতে দেবেনা তুমি ?

নিতাই পাল্টা মজা করে । বলে : তোর ট্র্যাক রেকর্ড ভালো না । তুই বিবাহিত মাছ ছিপে ধরিস্ । বেশি সময় বাড়িতে থাকলে শেষে তোর দিদি ভয় পেয়ে যাবে ! আরে বুড়ো বয়সে বৌ না থাকলে আমি বাঙালী ব্যাটা যাবো কোথায় ?

নিতাই খুব মজার মানুষ । স্কলার । আমেরিকা থেকে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ে এসেছে । কর্ণেল ইউনি থেকে । ফিজিক্স নিয়ে পড়ে এসেছে, কিন্তু স্কুলে পড়ায় । একটু ক্ষ্যাপাটে । মাইনে, এসব

স্কুলে খুব একটা কম নাহলেও নিজেকে মোটিভেট করা একটু মুস্কিল বলে মনে হয় ইরার । নিতাইদার সমস্ত বিদেশী ডিগ্রীগুলো একপ্রকার জলেই গেলো বলে মনে হয় । কারণ স্কুলের টিচার হবার জন্য এত্তোগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই ফাই ডিগ্রি লাগেনা । কোন একটি উইনিতে নাকি লেখা ছিলো , নিতাইদা নিজেই বলেছিলো আগে :

32 nobel laureates adorn our chair, why not you ---?

সে যাইহোক এত্তসব করে টরে ইস্কুলে পড়ানো । আর সম্বন্ধ করে দিদিকে বিয়ে করা । একেবারে সাত্পাকে ঘুরে টুরে ! তারপর মধুচন্দ্রিমা এই পঞ্চগণিতে । আর মহাবালেশ্বরের স্ট্র-বেরি ফার্মে । জায়গা ভালো লেগেছিলো বলেই গাজিয়াবাদের ইস্কুল থেকে সোজা এখানে হাজির । দিদিও দিল্লী থেকে মুম্বাই বদলি নিয়ে এলো । তারপর বাবা মাকে নিয়ে এলো ।

ভালই আছে ওরা । ঘোরতর সংসারী । ছাত্র ঠ্যাঙানো আর সন্তানের আবদার এইগুলো ওদের চলার পথের পাথেয় ।

দিদি , ইরার মতন স্বাধীনচেতা কখনই ছিলো না । লেখাপড়া করে বাবার কথামতন সুপাত্রের গলায় মালা দিয়ে সুখী মেয়ে ।

গুড গার্ল । একেবারে সমাজ যা চায় সেরকম । উল্টোদিকে ইরাবতী অন্যরকম । ভার্জিনিটি হারিয়েছে কলেজেই । এক বৃষ্টিমুখর রাতে ।

পরের দিন কলেজ যেতে পারেনি । বার বার মনে হচ্ছিলো : অ্যাম নো মোর আ ভার্জিন !

এই চিন্তায় রাতে ঘুম হয়নি । ওর এক বিবাহিতা বন্ধু পরীক্ষা করার জন্যে পুরো ডিটেলস্-এ প্রক্রিয়াটা জানতে চেয়েছিলো ।

আর বলেছিলো : কাউকে বলিস্ না যেন । লোক জানাজানি হলে বিপদে পড়বি ।

পরে তো ও চাকরিতে ঢুকলো । আস্তে আস্তে সিনিয়ার হল । ভালো মাইনেপত্র পেলো । একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনলো । ওয়ান বেডরুম আর বড় ডাইনিং কাম লিভিং রুম । একেবারে চারতলায় । দক্ষিণ শহরতলিতে । অবশ্য শিরিষ সিন্হা ওকে কম সুদে লোন দিয়েছিলো । ওরা কোম্পানি থেকে লোন নিতে পারে যদি পাঁচ বছরের বেশি এক নাগাড়ে, ভালো রেকর্ড করে কাজ করে যেতে পারে । শিরিষ বলেছিলো : লোন শোধ না করতে পারলেও ওর চলবে ।

কিন্তু ইরা লোনটা শোধ করে দেবার কথা সবসময় মাথায় রাখতো তাই চাকরি ছাড়ার পরে জমানো টাকা থেকে লোনটা শোধ করে দিয়েছিলো যদিও শিরিষ নিতে চায়নি । অ্যাকাউন্টস্ এর লোকদের বলে দিয়েছিলো যেন ওরা না নেয় । কিন্তু ইরা, চেকটা ওদের টেবিলে দিয়ে এসেছিলো ।

ও যখন কোনো জায়গা থেকে চলা শুরু করে তখন বাঘের মতন পিছুডাকের ধার ধারেনা । আর তাকায় না পেছন ঘুরে ।

শিরিষ ওর মনের মধ্যেই থাকবে সেই পরজন্মের জন্য তোলা । ওর সত্যি তো কোনো তাড়া ছিলোনা ।

একজন মেয়ে একজন পুরুষকে বিশেষ করে লোভী পুরুষকে যা দিতে পারে বন্ধ ঘরের ভেতরে তাই দিয়েছিলো ইরা । কিন্তু তখনও জানতো যে এই দেওয়া ক্ষণস্থায়ী যেটা ওর কলেজ জীবনের প্রেমিক সেই রেভেনিউ অফিসারের ক্ষেত্রে জানতো না ।

শিরিষকে ও ভালোবাসে । যদি সিঁদুর আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট বাদ দিয়ে বিচার হয় তাহলে শিরিষ ওর স্বামী । কারণ ও ইরার রক্ষক । কুচক্রীর হাত থেকে কিংবা বদমাইশের লোভী দৃষ্টি থেকে । আর সবথেকে বড় কথা হল শিরিষের সান্নিধ্যে ও নিজেকে একজন পূর্ণ মানুষ বলে মনে করে । এই সম্পর্ক এক জন্মের হতেই পারেনা । এত গভীরতা , এত আকুতি জাস্ট এই আর্থ প্লেনে হঠাৎ দেখা হয়ে ---নাহ্ ! সেটা অসম্ভব ।

শিরিষ ওর সোলমেট । বিয়ে তো সবাই করে কিন্তু সোলমেট কজন পায় ? শিরিষ ওকে অনেক দিয়েছে, তার বদলে ও যা দিয়েছে- তাকে টেম্পটেশান বলবে না ও । বলবে প্রেম ।

আর ভবিষ্যতে যদি এমন কিছু করতে পারে যা সিন্হা সাহেবের চরম প্রয়োজনের সময় করা হবে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবে । আর পরজন্মে তো দেখা হচ্ছেই !

বন্ধুরা বলতো যে তুই এতটা সিওর কী করে যে পরজন্মে দেখা হবেই ? ইরা হেসে বলে : আমি ওকে এতই ভালোবাসি যে মৃত্যুও আমাদের মধ্যেখানে থমকে যাবে । স্তব্ধ হয়ে যাবে ।

গীতা পড়িসনি ? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়----

জামাকাপড় ছেড়ে অন্য জামা ---

বন্ধুরা সেন্টেন্স কমপ্লিট করে দেয় : *না পরে একেবারে জন্মদিনের পোষাকে পরজন্মে শিরিষের খপ্পরে পড়া- কী বলিস্ ?*

দেঁতো হাসি দিয়ে সরে পড়ে ইরাবতী ।

শিরিষ একবার ওকে নিয়ে কাজে গিয়েছিলো দাদ্‌রা ও নগর হাভেলিতে । ব্যবসার কাজে । ওখানে কিছু মানুষের বাসা তৈরি হবে শিপিং কন্টেনার দিয়ে । সেইসব ব্যাপারে একটু জায়গাটার আবেগ ও কালচার সম্বন্ধে জানতে যায় । মোট সাতদিন ছিলো ।

দুজনের সাথেই বোঠানের কথা হত, রোজ রাতে ।

একই বিছানায় শুয়ে , বোঠানের জায়গাটি দখল করে কানে ফোন নিয়ে একনাগাড়ে কথা বলে যেতো ইরা । দুজনের একই বিষয় । শিরিষের যেন ভালো হয় । শরীরের দিকে যত্ন নেয় ইত্যাদি ।

ওষুধ বিষুধ সময় মতন খায় । ব্যস্ততার কারণে লাঞ্চ মিস্ না করে এইসব । বোঠানের ঘ্রাণশক্তি হয়ত তেমন তুখোর নয় । ভোঁতা । নাহলে এতবছর ধরে চলা নাটকের কিছুই আঁচ করতে পারেনি ?

দাদ্‌রা ও নগর হাভেলিতে ওরা একটা পরিত্যক্ত পর্তুগীজ ভিলায় ছিলো । অনেক বছরের পুরনো বাড়ি । কোনো ধনীর বাড়ি । এইরকম বাইরের লোকেদের, ভাড়া দেয় । ভিলা হিসেবে । পরিত্যক্ত কারণ --কোণায় কোণায় লেগে আছে নির্জনতার চিহ্ন আর ধূলোর সুবাসে মাতোয়ারা প্রাচীন কাঠামোটি । শতাব্দী পুরনো এই বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসে আর সেটাই ওর ইউনিক সেলিং পয়েন্ট । কেউ কোথাও নেই , নেই যেন কোনো বায়বীয় দেহলতাও । প্রতিটি খাঁজে খাঁজে গল্পের ইশারা কিন্তু সেই গল্প , কথামালায় ধরার কেউ নেই । যেন কোনো বিরাট জাহাজ ডুবি হয়েছিলো এখানে । সেই জাহাজের কিছুটা অংশ এখনও জেগে আছে ইতিউতি নানান সুদৃশ্য অ্যান্টিক ছড়িয়ে ।

এখানে সাতদিন ছিলো ওরা । রোজ রাতে কাজের শেষে, প্রিয় মানুষের বাহুডোরে বাঁধা পরাও বেশ ভালো বলে মনে হয় ইরার । কাজেই সময়টা ভালই কেটেছে । দেহের মিলন তো কয়েক মিনিটেই পুড়ে শেষ হয়ে যায় দেশলাই কাঠির মতন । তার আগে ও পরে যেই আবেগ দেখা যায় ওর কাছে সেটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট । ও একটু রোমান্টিক সাইডে আছে । তবে শিরিষকে সবটুকু উজার করে দিতে ওর মন্দ লাগেনা । শুনেছিলো পুরুষ মানুষ এক ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেনা । সবসময় ছোঁক ছোঁক করে ।

কিন্তু শিরিষের সঙ্গে যদি ওর আগেই বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে সে অন্য কোনো ফুলে আর বসতোই না --এই ব্যাপারে ও একশো কেন দু হাজার পার্সেন্ট সিওর । শিরিষকে- আর ওর মনকে, ইরা নিজের হাতের তালুর মতন চেনে ।

প্রথমবার শুধু ওকে বলেছিলো অসম্ভম ভদ্র শিরিষ যে আই অ্যাম সরি ইরা --এই হিউজ জিনিসটা ঐ ছোট স্পেস দিয়ে পাস করবে তাই খুব লাগবে , কিন্তু এছাড়া আমাদের ছেলেদের কাছে আর অন্য কোনো মেকানিজম্ নেই ।

ইরা অবশ্যই বলেনি যে আগে ওকে, প্রায় রেপ করেছিলো ওর বয়ফ্রেন্ড । আর পরে ওর সম্পর্কেই বন্ধুমহলে বলতো : বাসি মাল । বলতো : আমি তো স্পিনার নই যে ইউজ্ড বল নেবো !

আর ইরার ব্যাথা লাগেনি মোটেই । বরং ভীষণ ভালোলেগেছিল । মনে মনে বলেছিলো যা ওর বন্ধুরা ওকে ক্ষ্যাপাতো, বারবার মনে করিয়ে দিয়ে -----মিসেস্ ইরাবতী সিন্হা ।

সমাজ যাই বলুক , ভাবুক -আজ থেকে ও মিসেস্ ইরা সিন্হা ।

চাকরি ছাড়ার পরে কিছুদিন তো পঞ্চগণিতে ছিলো । তারপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসে পৌঁছায় এই লখিমগড় দ্বীপে । এখানে একজন মহিলা ভাস্কর, যিনি গার্বেজকে সোনালী আলোয় মুড়ে করেন অপরূপা- তিনি একজন লজিস্টিক কোম্পানিতে কাজ করা সেক্রেটারি খুঁজছেন । আর ইরার তো এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা আছে- কাজেই চাকরিটা হয়ে গেলো । ভালো মাইনে দেবে...হয়ত আগের কোম্পানির মতন নয় তবে থাকা ও খাওয়া ফ্রি । ওর সঙ্গেই থাকতে হবে ।

আগে গিয়ে সব দেখেশুনে আসে । তারপর যোগ দেয় ।

লখিমগড় দ্বীপটি খুব ইন্টেরেস্টিং , একটি দূর্গ যার চারদিকে আছে বড় বড় দরজা আর সেখানে পাহারাদার । ভদ্রমহিলা, বিদেশে ওর ভাস্কর্য ও ক্রাফ্ট নিয়মিত পাঠান তাই একজন তুখোর লোক দরকার যার এইধরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে । ইরাকে দেখেই ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে মেনল্যান্ড ছেড়ে , এইরকম এক বড় লজিস্টিক কোম্পানির কাজ ছেড়ে ও এই দ্বীপে কেন আসতে চাইছে ?

ইরা বলে : অনেকদিন ধরে তো কাজ করলাম বড় অর্গানাইজেশানে । ওখানে অনেক কমিটমেন্ট লাগে । খুব সিরিয়াস ব্যাপার স্যাপার । তাই ভাবলাম এবার ওর থেকে কম দায়িত্বের কিছু একটা করি । তাতেই আমি খুশি থাকবো । আমি তো একা !

ভদ্রমহিলা বোধহয় ফেমিনিস্ট । সঙ্গে সঙ্গে বললেন : দেখো, এই আধুনিক যুগে মেয়েরা একা একাই জীবন কাটাতে পারে । কোনো পুরুষ গাছের প্রয়োজন হয়না । মার্শাল আর্ট শিখে নিলে কোনো বজ্জাত , লোলুপ পুরুষও কিছু করতে সক্ষম হবেনা । আর বহু পুরনো ইতিহাস থেকে জানা যায় , ভারতে মেয়েরা আগে একাই সব করতো । পরে এই ঢাক ঢাক গুড় গুড় এসেছে ।

একজন মানুষের পূর্ণতা আমার মতে সে কি সমাজকে দিয়ে গেলো তার ওপরে । কোনো লাইফ পার্টনার জোটানো অথবা কিড্স এর ওপরে নয় । বিয়ে আর সন্তান পালনের চেয়েও দুনিয়া কোটি কোটি ইস্যু আছে যার জন্য মানুষ তার জীবন অর্পণ করতে পারে । আর অসুবিধে বলতে হয়ত শেষ বয়সে একাকীত্বে ভুগতে পারে । কিন্তু

তখন হাতে ফ্রি সময় বলে এমন কাজ করা যায় যেগুলি ব্যস্ততার জন্য আগে হয়নি । হয়ত বৃদ্ধ বয়সে দেহ দূর্বল হয়ে বিপত্তি ঘটাবে । তাতে কি ? সবকিছুরই সময় মতন সলিউশান বার হয় । আর যেভাবে গবেষণা এগোচ্ছে তাতে মানুষের বার্ধক্য হয়ত আর আসবেই না । যতদিন যাবে, মানুষ তত তারুণ্যে ভরে উঠবে , কে জানে ? বয়স যাবে পেছনদিকে !

ইরা আর বলেনি যে ওর জীবনদর্শন ঠিক এইরকম নয় । সে ভালোবেসে, মিসেস্ ইরাবতী সিন্‌হা হতে ইচ্ছুক ছিলো । সমাজের চোখে নাহলেও -মনে মনে । পদচিহ্ন রেখে যাওয়া টাওয়া বড্ড গভীর ব্যাপার । খুব কঠিন কঠিন কথা । ওসব ইরাবতীর জন্য নয় । এর জন্য হয়ত গোদাবরী বা কোনো সুবর্ণরেখা জন্মেছে , কোথাও !

দিনে দুবার খায় জুনিরা । সারাদিন কাজে লেগে থাকে । সকালে হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেয় । আবার সন্ধ্যায় ডিনার করে নেয় । মাঝে টুকটাক স্ন্যাক্স্ খায় । আর এন্তার চা ও কফি ।

ঠিক এরকম নাহলেও, ইরার নিয়মও অন্যরকম । সাধারণের থেকে । তাই মানিয়ে নিতে অসুবিধে হলনা ।

রবিবার স্পেশাল রান্না করতো জুন । হাঁসের ব্রেস্ট দিয়ে কারি , সর্ষে ভেট্‌কি, মৌরি বাটা দিয়ে কৈ-মাছ ,চিংড়িমাছের কারি ধনেপাতা বাটা দিয়ে ,কুমিরের মাংসের বিরিয়ানি , গাছ-পাঁঠা

নারকেল দিয়ে-তারপর ডিমের কুসুম ব্যাটারে ভেজে তার কারি সমস্ত হত পালা করে করে । ওর এক পুরুষ বন্ধু আছে । এক এক্স কমান্ডো । খুব স্মার্ট আর সাবলীল । সেও আসে । এই লখিমগড়েই তার বসবাস । দুজনে খুব আড্ডা দেয় ।

প্রথমে ইরা থাকে সেখানে, সেই একান্ত আপন আড্ডায় । পরে ও ঘোরার নাম করে বেরিয়ে যায় সাইকেল নিয়ে ।

এই নো-স্মোকিং আইল্যান্ডে, সাইকেলে চড়ে মানুষ নানান জায়গায় যায় । ইরা, রোজ সকালে এক ঘন্টা সাইকেল নিয়ে ঘুরে আসে । ব্যায়াম আর কি !

কিকি বলে একটি লোক আছে । তার সাইকেলের কারখানা আছে । সে সাইকেল সারায় । এখানে সাইক্লিস্ট যারা- তারা বিশেষ শ্রদ্ধেয় ।

কারণ সাইকেল চড়ে গেলে দূষণ হয়না আর দেহও থাকে মজবুত । তাদের জন্য দেশী কাফে চালায় কিকি । কিকি তলাপাত্র । বাইরে থেকে এসেছিলো । অ্যাসবেসটস্ ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়ে । গুদামের ম্যানেজার । পরে ঐসব ফ্যাক্টরি তো বন্ধ হয়ে গেলো । তবে কিকি তলাপাত্র তার অনেক আগেই কাজ ছেড়ে সাইকেল নিয়ে মাতে । যেই কাফে চালায় সেখানে সাইক্লিস্ট কূলের জন্য পুষ্টিকর প্রাতঃরাশ মেলে । স্বাস্থ্য ভালো থাকবে যেই খাবার খেলে । ঐ কাফেতে আসলে সব খাবারই পুষ্টিকর । আর যখন রেস হয় তখন তো কিকির পোয়া বাড়ো । সাইকেলে বৈকল্য দেখা দিলেই ওর ডেবিট ক্রেডিট বাড়ে কমে । চমৎকার কাটে সেইসব রেসের সিজন ।

এক্স কমান্ডো হিমল তামাং-কেই পুরো ক্রেডিট দেয় লখিমগড়ের মানুষ , দ্বীপটিকে নো স্মোকিং জোন করার জন্য । এখানে কেউ সিগারেট পান করে না । মানে লাংস্ থাকবে একেবারে ক্লিন । ফুসফুসে আর জমবে না বিষ । দূষণ । পরবর্তী প্রজন্ম একেবারে আকাশ থেকে নেমে- পার্ফেক্ট হেল্থই মেনটেন্ করে যেতে পারবে । অর্থাৎ হীরের নয় অক্সিজেনের চামচ মুখে নিয়ে নামবে ।

কিকির কাছে শুনেছে রসিকলালের গল্প । আগে এখানেই একটি ইটখোলায় কাজ করতো । মেরুন আর বাদামী রং এর সেসব ইট । সবুজ ঘাসবনে যখন ইট পাটকেল ছড়িয়ে থাকতো তখন কিকির বড় ভালোলাগতো দেখে । সবুজ মেরুন , একেবারে মোহনবাগানের ফ্ল্যাগের রং । দূরে সোনালী সর্ষে ক্ষেত । আর উদার নীল আকাশ । তাজা বাতাস । দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় ।

আমরা প্রকৃতির সন্তান । দূর্যোগ আর সিংহ-বাঘের ভয়ে ছাদের নীচে থাকা ব্যাতীত অন্যসময় নেচারের কোলে থাকলেই আমরা সবথেকে ভালো থাকি ; এটা তো মর্ডান মানুষ ভুলেই গেছে । ওরা পাখির ডাকের সাথে পরিচিত হয় প্রথম, ইউ-টিউবে । সকালে উঠে দেখে **ই-বাগানে** ফুলের ছবি । সৌভাগ্যবশত:যদি বা নেচারের কোলে পৌঁছেও যায় তখন মোবাইলে রেকর্ড করে আনে নদীর , ঝর্ণার উত্তাল জলের শব্দ । যাকে অবলম্বন করে কাটাবে আরো কয়েক যুগ -এরকমই জীবন প্লাস্টিক মানুষদের ।

ওরা মাটির হাড়িতে রান্না করা খাদ্যের স্বাদ জানেনা । বাড়ি বসেই বিদেশের খানা খাওয়া সম্ভব হলেও শালপাতার থালায় খিচুড়ি, পাঁঠার মাংস, মাটির কলসীর শীতল জল আর ভাঁড়ে গরমাগরম চা-ইত্যাদি খাবার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত । ওরা একরাশ ভোরের শিউলি হাতে তুলে শুঁকে দেখে না । ঝরা বকুল ফুলে মালা গাঁথে না । ওরা শুধু যেন প্লাস্টিক শুঁকে দেখা আর রবারের জামা পরার জন্য জন্মেছে । সমস্ত কিছু ইউজ অ্যান্ড থ্রো করে বড় হওয়া ওরা শেষমেশ প্রিয়জনেদেরও ইউজ অ্যান্ড থ্রো করে ফেলে ।

সেই যাইহোক ঐ ইটখোলা একদিন বন্ধ হয়ে গেলো ।

কারণটা কিছুই নয় ; ঐ জায়গাটির পেছনদিকে হঠাৎ একটি ঝর্ণা বা মাটির নিচ থেকে আসা ফোয়ারা আবিস্কৃত হল ।

সেই ঝোরার জল অসম্ভব ঠান্ডা । গরমকালেও সর্বদা জলরাশি বয় । মানে ফোয়ারার মতন । খুব শীতল এই জল, একটি কূয়োর মুখের মতন সাইজের গর্ত থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত । সেই অঢেল জল খুবই মিষ্টি স্বাদের ।তাই লোকাল রাজনৈতিক মানুষেরা, স্থির করলো আলোচনা করে যে এই ব্যাপারটি দৈব না হয়ে যায়না। সারাবছর এত শীতল জলপ্রবাহ আর অকস্মাৎ এর সন্ধান পাওয়া বেশ ম্যাজিকাল ব্যাপার । তাই লোকাল ভীম-দল ইটখোলা বন্ধ করে দিয়ে ওখানে গড়ে তুললো মন্দির । এই মন্দিরে এখন এই জল পাওয়া যায় দেবীর প্রসাদ বা চরণামৃত রূপে । তবে প্রকৃতি প্রেরিত

এই তরলিত চন্দ্রিকা এখন কড়ি দিয়ে কিনতে হয় । সমস্ত টাকা যায় ভীমদলের পার্টি ফান্ডে ।

এই রাজনৈতিক দলের অফিসে সাদা জিলিপি পাওয়া যায় । সেই জিলিপি ভাজে রসিকলাল । ঐ দলের মানুষই ওকে এই কাজ দিয়েছে । তবে দিনের অল্প সময় সেই জিলিপি ভাজা হয় । বাকি সময় রসিকলাল, ইরার মালকিন জুনিরা ও অন্যান্য মানুষকে- নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি করে গার্বেজ সাপ্লাই করে ।

মানুষটি মূর্খ হলেও খুব বড়মাপের বলে শুনেছে । কয়েকবার দেখেছে । ওর দারিদ্র্য আর ময়লা কুড়ানো অবয়বের মাঝখানে নাকি বাস করে অসাধারণ এক দরদী মানুষ । যে অন্যের দু:খে নিজের জীবন পর্যন্ত পণ করতে পারে ।

দেখতে মানুষের মতন হলেই যেমন কেউ মানুষ হয়না সেরকম একেবারে ভাঙাচোরা , জীর্ণ একটি অবয়ব থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে মানবতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত । বাজে সুমধুর বেণু । হঠাৎ হঠাৎ ও ক্রমাগত --- যদি ইতিহাস ঘেঁটে দেখা হয় তখন দেখা যাবে যে মানুষের শুধু ল্যাজটা খসে গেছে । পশুর থেকে বেশী জান্তব হয়ে গেছি আমরা । নিজেদের উত্তরণ নিয়ে আর কেউ ভুলেও মাথা ঘামাই না । এত স্বার্থপরতা দিয়ে গড়া দুনিয়ায় আমরা পরবর্ত্তী প্রজন্মের জন্য কী রেখে যেতে পারবো ? হানাহানি আর ধ্বংস ব্যাতীত ?

রসিকলালের সাথে ইরার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে । ওর চিরটাকালই বয়সে বড় এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব হয় । বুড়োবুড়ি ওর বেশি বন্ধু । ওদের বাড়ির কাছে এক বুড়ো, শিখ ট্রাক ড্রাইভার ছিলো । সবাই সিংজী বলতো । বাঙালীদের কাছে পাঞ্জাবী মানেই সিং আর দক্ষিণী মানেই মাদ্রাজী ।

সফটওয়্যারের পরে বাঙালী জেনেছে যে কন্নড় , মালয়ালি , টুলু, তামিল, তেলেগু এইসব দক্ষিণী, দ্রাবিড় মানুষেরাও ভারতে আছেন। কাজেই সিংজীর নাম সহজেই লোকে দিলো সিংজী । আসল নাম কী কে জানে আর ! একজন যেমন বলতো যে রসম্ মানে নাকি ভাত । তাকে কিছুতেই বোঝানো যেতো না যে রসম রাইস ভাত কিন্তু রসম আসলে স্যুপ । আর ইংরেজদের **Mulligatawny** স্যুপের উৎসস্থল এই রসম্ ।

সে যাইহোক সেই সিং লোকটি মাসে একবার বাড়ি আসতো । ওর বৌ সব বাচ্চাদের মানুষ করেছিলো । মোট পাঁচজন ছিলো । একজন আবার চন্ডিগড়ে চলে যায় । সেখানে কাজ করতে করতে এক নতুন ব্যবসায়ীর নেকনজরে পড়ে । ছেলেটির ,মানে ঐ তরুণ ব্যবসাদারের বাবা কলকাতায় দুটি আর নেপালে একটি হায়ার সেকেন্ডারি ইস্কুল চালাতো । ওর মা সেইসব ইস্কুলের মধ্যে একটির হেডমিস্ট্রেস ছিলো ।

উমা আহুজা । বড় ছেলে হাইলি কোয়ালিফায়েড্ ।আমেরিকায় ফেড-এক্সে কাজ করতো । ছোটজন কৈশোর থেকেই ব্যবসার জন্য বাবা মায়ের কাছে টাকা চাইতো । লেখাপড়ায় মন নেই । কেউ ভাবতোও না যে সে কোনদিন কোনো স্কলার হবে ।

হলই সেরকম । ঘোলের দোকান দিয়ে শুরু । পরে হোটেল , আরো ইস্কুল (কমার্শিয়াল), ডিজাইনার ফার্নিচারের দোকান এইসব করে কোটিপতি । ওর নাম সংকেত আহুজা । হিন্দী সিনেমায় যেরকম ক্রিমিন্যালদের সৎ পথে আনার নানান পন্থা দেখানো হয় সেই জিনিসই সংকেত বাস্তব জীবনে ফলো করতো । বলতো : আজকাল যা সমাজের অবস্থা, ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে । আমি এরকম কাউকে দেখলেই আমার কোনো সংস্থায় চাকরি দিয়ে দিই । তারপরে ওকে কোনো গুরু দায়িত্ব দিই । দেখি কিরকম পারফর্ম করে । কড়া নজর রাখি । তারপর অপরিচিত শহরে পাঠিয়ে মেনস্ট্রিমে ঢুকিয়ে দিই । আমার মনে হয়- চোর,জোচ্চোর বদমাইশদের তাও কিছু মনুষ্যত্ব আছে কারণ ওরা অলরেডি চিহ্নিত হয়ে গেছে মন্দ মানুষ বলে । ওদের আর লুকানোর কিছু নেই । কিন্তু যারা সৎ সেজে থাকে তারাই বেশি ডেনজারাস্ । তাই আমি ওদের

যেটুকু মনুষ্যত্ব আছে সেটা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করি । ওটাই বেশি সহজ কাজ । গাধা পিটিয়ে মানুষ করার চেয়ে ! আর কে বলেছে যে অপরাধীদের কোনো সততা থাকে না ?

ওদের একটা বেসিক লেভেল অনেস্টি তো থাকেই । নিজের বসের প্রতি , নিজের প্রফেশনের প্রতি । নাহলে অর্গানাইজড্ ক্রাইম এই জিনিসটা চলে কী করে ?

সেই সংকেতের সংস্পর্শে এসেই, এই লরি ড্রাইভার সিংজীর একটি ছেলে হোটেলে ম্যানেজারের কাজ পায় হিমাচল প্রদেশের এক শহরে । পরে ওর বুদ্ধি আর সততা দেখে ওকে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠিয়ে দেয় সংকেত । এখানে এখন ও একটি ডিসেবিলিটি সাপোর্ট সিস্টেমে কাজ করে ম্যানেজার হিসেবে । আর একটি পাঞ্জাবী হোটেল চালায় । সেখানে থাকার ব্যবস্থা আছে লং ডিস্টেন্স যাত্রীদের । ২৪/৭ খোলা থাকে ।

বাটার চিকেন আর চিকেন টিক্কা মসালা অমৃত সেখানে । পাওয়া যায় স্মোকড্ বিরিয়ানি । কেমন যেন ধোঁয়ার গন্ধ তাতে । দূর্দান্ত খেতে । বেগুনের ভেতরে পুলাউ দিয়ে একটা কোপ্তার মতন ভাজে । খুব পপুলার খানা সব । ছেলেটির নাম করণ । করণ সিং তবে গ্রোভার নয় । সে বলতো ইরাকে ,দেশে গেলে ::: ইরাদিদি, হোটেল থেকে অনেক কামাই । তবে চাকরিটা মনের আনন্দের জন্য করি । আমার ভালোলাগে । তবে ইগোতে নিই না । মনে করি ওদের আমাকে দরকার তাই আমি এটাকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছি ।

সংকেত ওকে বড় প্রফেশন্যাল হবার জন্য বিদেশে পাঠায় । কিন্তু ও জীবন কাটানোর জন্য হোটেল খুলে বসলেও প্যাশান হিসেবে সমাজ সেবা করে । ইরার খুব ভালোলেগেছিলো এই অ্যাপ্রোচটা ।

তবে সবটাই নীরবে করে । টুইটারে টুইট্ করে কিংবা ইন্সটাগ্রামিং করে করে মানুষকে জানায় না ।

একবার হোটেলের আয়ের ৬০ পার্সেন্ট ও ডোনেট করে দিয়েছিলো এইসব বিকলাঙ্গ মানুষের জন্য ।

--ইরাদিদি , ওদের কত কষ্ট বলতো ? প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটা ওদের কাছে বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ । কারো কারো কাছে নিজ অস্তিত্ব নিয়েই সংকট দেখা দেয় । কেমন জন্বির মতন দিন কাটায় ওরা । আমার ভারি কষ্ট হয় জানো দিদি!

আমাদের পরিবারে দারিদ্র্য আছে , বাবা তো লরি চালায় ।ভাইবোনেরা একপ্রকার মানুষ হয়েছি । কিন্তু মায়ের দিকে বা বাবার দিকে কেউ ডিসেবেলড্ নয় । ওয়াহে্ গুরুর আশীর্বাদ । তবুও আমার ওদের জন্য এত দু:খ লাগে যে কী বলবো । আমি সেজন্য ওদের কাছে থেকে কাজ করি । আর কমফর্ট লেভেল তৈরি হয়ে গেলে বোঝা যায় যে ওরাও কী ভীষণ মানুষ ।

কত সেন্সিটিভ , সুন্দর , ক্লেভার সবাই !

এগুলো শুনে ইরার মনে হল যে সংকেতের কাজ সফল হয়েছে । সার্থক সংকেত তোমার করণ সিং কে পরবাসে পাঠানো ।

ওর হিউমান সাইড যে বিকশিত হতে পেরেছে সেটা দেখে ইরার খুব ভালোলেগেছে। ও আসলে একটি গ্রামে একবার ছুটি কাটাতে যায়। সেখানে চাষীরা, বহুদিন যাবৎ কোনো বৃষ্টি না হওয়াতে একটি শিশুকে ধরে এনে বলি দেয় আর সেই রক্ত ও নরমাংস দিয়ে কোনো দেবীর পুজো অর্চনা করে। লরি-চালক সিংজীর এই পুত্র সেখানে ছিলো আর কিশোর বলেই হয়ত কিছুটা মজা দেখার জন্য সেই বলিদান অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ও শিশুর হাত ও পা বাঁধায় সাহায্য করে। পরে বিচার হয় কিন্তু ওকে শুধরানোর জন্য অন্যত্র পাঠানো হয় কারণ ও কিশোর।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে জাজ করে ফেলি। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যায় যে আদতে সবাই সেই একই কনশাসনেসের পার্ট যা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে আলোকিত করেছে। আসলে শিরিষের কৃষ্ণ ভজনা আসরে অনেক বৈষ্ণব সাধকেরা আসতেন। কেউ কেউ কৃষ্ণকে দেখেছেন। কারো কারো কাছে কৃষ্ণ বন্ধু : কৃষ্ণা ইজ মাই ফ্রেন্ড এইসব বলতেন তারা।

জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলনের কত গল্প শুনেছে ইরা।

ওর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো ঝামেলা নেই। ও বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী দুই দলকেই শ্রদ্ধা করে। সবার নিজ নিজ দর্শন। তাই নিয়েই মানুষ বাঁচে। এইভাবেই প্রবাহিত হয় মনুষ্য জীবন।

তাই ও এইসব ঘটনা শুনে অবাক হয়না। আনন্দিত হয়। যে কৃষ্ণের এত ম্যাজিকাল পাওয়ার ! ও আলোড়িত হয় অন্তরে।

সুখ লহরীর স্পর্শে ও পবিত্র হয় ।

কবীর বলেছিলেন না যে গড বলে বাইরে কেউ নেই । তোমার কনশাসনেস্ই গড । শুধু একটা পর্দা আছে দুজনের মধ্যে । সেই পর্দার নাম মন , চিন্তা কিংবা থটস্ যাই বলো । যখন নো মাইন্ডে চলে যাবে আর সেই স্টেটে পার্মানেন্টলি থাকবে সেটাই মোক্ষম্ ।

Lift the veil that obscures
the heart and there
you will find what you are
looking for.

এইসব দোহা ও শুনেছে সেই কৃষ্ণ-কানহাইয়ার মন্দিরে । শিরিষকে, অনেকে ওর কৃষ্ণ বলতো । বলতো যে ::দেখ্ ইরাবতী, রিয়ল কৃষ্ণের অনেক গোপিনী , বৌ আর গার্লফ্রেন্ড রাধারাণী । তুই খুব লাকি । তোর কৃষ্ণের একটাই বৌ । সেই বৌয়ের সাথে আগেই বিয়ে হয়ে গেছে তাইজন্য । তখন আর তুই কোথায় ? নাহলে তোকেই পার্মানেন্ট করে নিতো ।

সে যাইহোক্ অনেক তত্ত্ব কথা ও অধ্যাত্ম কথা শুনেছে ।

শিরিষ খুবই ধর্মভীরু মানুষ । কাজেই ইরাও নিজেকে বদলে নিতে আরম্ভ করে- নাহলে ও সাধারণ মানুষ । ধম্মো কম্মের ব্যাপারে ওর তেমন উৎসাহ নেই । ও জীবনকে উপভোগ করতে এই জগতে এসেছে । ওর নক্ষত্রের দিকে তেমন টান নেই । এনজয় লাইফ , হ্যাভ ফান ।

দা ওয়ার্ল্ড ইজ হিয়ার টু এনজয় -- এনজয় দা লীলা ---এও এক অবদূত মানে অবতারের বাণী । কৃষ্ণভক্ত অবদূত । ডাইরেক্ট গড থেকে যাঁরা

আসেন তাঁরা অবতার । তাঁরা জীবজগতের উদ্ধারের জন্য বডি নিয়ে আসেন । আর যাঁরা মানুষ অথবা অন্যান্য পশুপাখি থেকে মোক্ষম্ লাভ করেন , তাঁদের নাকি অবদূত বলে ।

কাজেই সংক্ষেপে :: লীলা উপভোগ করো-- এটাই হল ওর ফিলোসফি ।

রসিকলালের ফিলোসফি হল মানুষের কষ্ট দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া । তাই পুঁচকি নামক মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো । তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং পুঁচকি মরে গেলো । সবার নিজ নিজ ফিলোসফি থাকে । এই বৈচিত্র্যই দুনিয়াকে মধুময় করে ।

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে । ইরা লখিমগড়ে এসে থিতু হয়েছে । কাজে মন দিয়েছে । জুনিরার শিল্প ব্যবসা বিদেশে বেড়ে উঠেছে ।

ইরার কল্যাণে । রসিকলাল মদ নিয়েই আছে । আর গার্বেজ সাপ্লাই ।

কমান্ডো হিসেবে অবসর নেওয়া হিমল জুনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে ।

এক শুভলগ্নে ওদের শাদি হয়ে গেছে । তবে হিমল খুব রুক্ষ । জুন খুব মিঠেল । এইরকমই মনে হয় ইরাবতীর ।

ওদের কোনো সন্তান নেই । তাতে ইরার কোনো প্রবলেম নেই ।

ওর শিরিষের তিন সন্তানের কথা মনে হয় । কুহু , কলি আর কিন্নর ।

তারাই ওর নিজের বাচ্চার মতন ছিলো । আজও ওদের মিস্ করে ।

জুনিরা আর হিমলের প্রাইভেট লাইফ নিয়ে অবশ্যি ইরার কোনো মাথাব্যাথা নেই । যদিও জুনিরা ওকে বলেছিলো যে সে ফেমিনিস্ট টাইপের । আর হিমল ওকে ডোরম্যাট করে রাখবে না তাই ওকে বিয়ে করেছে । ওকে রেস্পেক্ট দেয় , ভালোবাসে আর পর্দানসীন করতে চায়না সংসারের বাহানায় । ওরা দুজনে সংসারের কাজ করে ।

রাতে একজন দেরি করে কাজ থেকে এলে অন্যজন রন্ধন সেরে ফেলে । একজন অসুস্থ হলে অন্যজন ছুটি নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যায় ।

সমানে সমানে কোলাকুলি আরকি । কেউ কারো সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না । বরং উৎসাহ দেয় । দেখতে গেলে জুনিরা তো বেশি সাক্সেসফুল । হিমল তো এখন আর কমান্ডো নেই । সাধারণ কাজে আছে । তবুও কিন্তু ওর মধ্যে কোনো জেলাসি নেই । জুনিরাকে ও সবসময় উৎসাহ দেয় আর বলে মাঝে মাঝে রিল্যাক্স করতে । নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে ওর ভাস্কর্য ও শিল্পকে নবজীবন দিতে । তবেই মানুষের ভালোলাগবে । নাহলে লোকে বোর হয়ে যেতে পারে ।

ইরার সাথেও হিমলের ভালো দোস্তি আছে । ইরার প্রাইভেট লাইফের গল্প শুনেছে সে জুনিরার কাছে । তাই হয়ত বলেছে : বি আ স্ট্রং ওম্যান ।

ওদের যেমন সন্তান নেই বলে ইরার কোনো ক্ষোভ নেই সেরকম ইরার কোনো হাজব্যান্ড নেই-- সেটা নিয়েও ওদের কোনো মাথাব্যাথা নেই ।

এক খুব বড় সেনা অফিসার ইরাকে বলেছিলো যে তুমি যদি বিয়ে না করো , তাহলে যতই কাজ করো -নাম করো তোমার জীবন বৃথা হবে । আর মা হতে না পারলে তো কথাই নেই । মাতৃত্ব মেয়েদের পূর্ণতা দেয় । ওরা পূর্ণ নারী হয় তখনই ।

ইরা শুধু উত্তরে বলেছিলো :সেটা নির্ভর করে আপনি মাতৃত্ব বলতে কী মিন করছেন । যোনি দিয়ে একটা মাংসপিন্ড পাস করালেই কেউ মা হয়না । আবার সেটা না করেও অনেকেই মা হিসেবে শ্রদ্ধা পান । মাদার টেরিজা আর সারদা মায়ের কটা গর্ভজাত সন্তান ছিলো ? নাও ডোন্ট সে দে ওয়্যার সুপার হিউম্যান । এ হল মানি কান্ট বাই হ্যাপিনেসের মতন স্টেটমেন্ট ।

হ্যাপিনেস মানে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ।

যদি ভুমধ্য সাগরে ক্রুজ করা কিংবা আল্পসের পদতলে বার্বিকিউ করে প্রিয়জনের সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটানো কারো হ্যাপিনেস হয় তাহলে মানি ডেফিনেটলি ক্যান বাই হ্যাপিনেস । নয়ত জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী ।

কাজেই চিরসুখ মানি কেন হানিতেও নেই । সেই সুখও একদিন উড়ে যাবে কর্পূরের মতন ।

অন্য কেউ ইরাকে ডিফাইন করবে আর ও সেটা মেনে নেবে , নাহ্ সেরকম মেয়ে ইরা নয় । আবার ফেমিনিস্টও নয় । ও ফোকাস্ড্ আর র‍্যাশনাল । ওর কোনো প্রেজুডিস্ নেই । ওর প্রিয় কোটস্ হল স্টিভ জবস্ এর : **“Why join the navy if you can be a pirate?”**

কাজেই ও খুশি নিজের Profile-নিয়ে । নিজের জীবন ও নিজের মতন করে কাটিয়েছে । কাটাচ্ছে । কোনো হাফ্‌বেকড্‌ সত্ত্বার অযাচিত উপদেশ আর ইডিওটিক ফিলোসফি নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যাথা নেই ।

ও খুশি আর সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য ।

সম্প্রতি ও জুনিরার কাজে বিদেশে ঘুরে এসেছে । জার্মানিতে গিয়েছিলো । পরে আরো অন্যান্য দেশে । এখানে কাজ করছে তা অনেক বছর তো হয়ে গেলো । বেশ মিশে গেছে জুনিরার সঙ্গে ।

জুনিরা আবার ওকে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে শিখিয়ে দিয়েছে ।

বলে : আজকাল যা প্লেন ক্র্যাশ হয় বাবা ভয় লাগে খুব । এবার বিদেশে গেলে জাহাজে করে যাস্‌ । আর জাহাজগুলো আজকাল সচরাচর ডোবে না । আর ডুবলেও সাঁতার শিখে নিলে প্রাণে বেঁচে যাবি । এই বলে ওকে সাগরে সাঁতার এই অভিনব কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিলো ।

আগে ও জলে হাত পা ছুঁড়লেও সেইভাবে সাঁতার শেখেনি । মজার ব্যাপার হল জুনিরা আর হিমল ওদের বোট থেকে ওকে ঝাঁপ দেওয়াতো মাঝ সমুদ্রে । আর সঙ্গে ওদের দুই বাঘা কুকুর জিকা আর জিমি থাকতো । তারাও ঝাঁপ দিতো ওর বডিগার্ড হিসেবে ।

বোট চলতো নিজ ছন্দে । আর ইরা, জিমি এবং জিকা সাঁতরে যেতো পাশে পাশে । এই নতুন জীবন ইরার স্তব্ধ ভুবনে এনেছিলো নতুন রং । একবার তো দীঘায় বেড়াতে গিয়ে, ঝাউবনের সামনে সোনালী সৈকতে রোদ পোহাতে পোহাতে শিরিষ ওকে বলেছিলো : এসো তোমায় সমুদ্র স্নান করাই । তারপরে ওর সারা গায়ে সোনালী বালি দিয়ে পাওডারের মতন লেপে ওকে সমুদ্রের জলে স্নান করায় । ও চীৎকার করে ওঠে : অ্যাই , ওদিকে চোরাবালি থাকতে পারে !

শিরিষ ওকে চুমু খেয়ে বলে : ভালই তো দুজনে একসঙ্গে মরে যাবো কিছু বোঝার আগেই । আবার সব নতুন করে পাবো । নিউ বিগিনিং ।

কিন্তু সেটা তো সুইমিং শেখা নয়, ওকে বলা যায় রোমান্স। এটা মানে জুনিরার সাথে যেটা হয়েছে সেটা রোমান্স নয়, রোমাঞ্চ । রীতিমতন ডুবে টুবে যাবার ভয় থেকে, দুইপাশে বাঘা জিকা আর জিমিকে নিয়ে- যারা নিজেরা ডুবে যাবে কিন্তু মণিবকে বাঁচিয়ে দেবে সেইসব জীবদের বন্ধু রূপে নিয়ে সাঁতরে বেড়ানো । সমুদ্রে আর জীবন নদে ।

আজ অনেক বছর পরে ইরা এসেছে বিদেশে । জায়গার নামটা উহ্যই থাক । শুধু বলা যাক্ যে এখানে বরফ পড়ে । প্রাচীন দেশ । সোনালী মানুষ । লাল ঠোঁট আর নীলনয়ন তাদের ।

এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা যিনি বেশ ধনী - ওর সব পুরনো জিনিস পত্রগুলি শিল্পকলায় বাঁধতে চান । জুনিরাকে দিয়ে ।

ইমেলে যোগাযোগ হয়েছে । কথাও হয়েছে । এমনকি পেমেন্টও হয়ে গেছে । এবার অফিসিয়াল কাজে ইরা গিয়েছে সেইদেশে । সেখানে ওর ১৫ দিন থাকার কথা । দু তিনদিন কাটার পরে বুঝেছে যে ভদ্রমহিলা খুবই ভালোমানুষ । আর বন্ধুত্বপূর্ণ । উনি যে ওর ক্লায়েন্ট তা বোধহয় উনি মনে করেন না । বরং ভাবেন ইরা ওর সন্তানের মতন । ওকে অনেক ছুটি দিয়েছেন দেশটা ঘোরার জন্য । টুরিস্ট হিসেবে ।

একদিন ওর কাছে ওর নাতি এসেছিলো অন্য শহর থেকে । সে নানান অসুখে ভুগতো । তারপর কোন এক মা মহেশ্বরীর কাছে গিয়ে সুস্থ হয়েছে । বহুদূরে -এক গ্রামে থাকেন ঐ সাধ্বী । ভারত থেকে এসেছেন । আগে সবাই বলতো মীনা মাতা । পরে মহেশ্বরী হয়ে বসেন ।

তার সঙ্গে নিজের গ্র্যান্ড মাদারকে দেখা করাতে নিয়ে যাবে নাতি ডুরান । যাকে আদর করে বৃদ্ধা ডাকেন ডোরি বলে । তো বৃদ্ধা ওকে শুধান : যাবে তুমি আমাদের সাথে ?

ইরার তো কাজ আছে অনেক তাই বলে : নাহ্ ! আপনারা ঘুরে আসুন আর ভারতীয় সেন্ট আমি অনেক দেখেছি । আমাদের দেশে এরা পথেঘাটে ঘোরে । আপনাদের দেশে এরা এত গুরুত্ব পাচ্ছেন । আমার আর নতুন কিছু দেখার নেই ।

আসলে ইরা ভেবেছিলো যে এই মহেশ্বরী মাও, ওয়েস্টে আরেক ইমপোর্ট - ইস্ট থেকে । নানান বাবাজী ও মাতাজীদের মতন । বেশিরভাগই ভন্ড । ড্রাগ্স্ , সেক্স আর মানসিক অসুখে ভরা পশ্চিমী দুনিয়ায় ক্ষণিকের আনন্দ দেওয়া এইসব সো-কলড্ সেন্টদের নিয়ে, যাদের আমদানি হয় মূলতঃ কোনো হেভিওয়েট সাদা অথবা অ্যাফ্রিকান শিষ্যের মাধ্যমে এই

অত্যাধুনিক দেশে- তাদের নিয়ে শিরিষের কানহাইয়া মন্দিরের এক প্রৌঢ় বৈষ্ণব একটি পুঁথি লেখেন । উনি আদতে সাহেব। নাম ছিলো সেই বইয়ের : স্ট্রিপিং দা সেন্টস্ অ্যান্ড সেজেস্ (ইমপোর্টেড্)।

বইটি নাকি স্পিরিচুয়াল দুনিয়াতে সাড়া জাগিয়েছিলো । অ্যামাজনে লঞ্চের ৪৮ আওয়ার্সের মধ্যে বেস্ট সেলার হয়ে গেছে । এসব দেশে এসে, কিছু স্পিরিচুয়াল গুরু ঠিক কী জাতের নোংরামো করে কিংবা ভুল দর্শন ও রীতিনীতি প্রচার করে ডলারের পাহাড়ে বসে ,পশ্চিমী মানুষের প্রাচ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সামাজিক শিথিলতার জন্য জমে ওঠা ক্ষোভ ও দু:খের সুযোগ নিয়ে সেই বিষয়ই বইটির মূল ভাবনা ।

কাজেই এই মহেশ্বরীকে নিয়ে ইরাবতীর কোনো বিশেষ উৎসাহ ছিলো না । ওর মনের ভাবটা ছিলো ::: করে নে যতদিন পারিস্, চুটিয়ে রোজগার করে নেয় । বাকি জীবন, ভারতে গিয়ে ডলার পাউন্ড ভাঙিয়ে খাবি ।

মহেশ্বরী স্বয়ং মা জগদম্বা । তাকে দূর্গা , কালী , তারা , ষোড়শী , ভুবনেশ্বরী , ত্রিপুরা সুন্দরী , বগলামুখী ইত্যাদি সম্বোধন করে করে অস্পষ্ট পশ্চিমী উচ্চারণে ডুর্গা , ম্যা ক্যাহ্লি , শাডাশী , ব্যাগলামুকি এইসব বলে সিম্ফোনির সুরে সুর দিয়ে গান হয় তারপরে সেইসব সিডি বিক্রি হয় । মাতাজীর অত্যন্ত মিডিওকার লুকস্ ;তাতে কী ? ওর ছবি ও পুতুলে বাজার ছেয়ে গেছে । মাতাজী নাকি সাপকে চুমু দেন । লোকে দেখেছে । তবে কাউকে জাপটে ধরেন না । উনি নীরব মা, জাপটে ধরা ফিজিক্যাল মাদার নন । আমরা সবাই আদতে এনার্জি । তাই ফিজিক্যালি

কাউকে জাপটে না ধরেও তাকে আশীর্বাদ করা যায় কিংবা স্পিরিচুয়ালি হেল্প করা সম্ভব । একে বলে স্পিরিট লেভেলে কানেকশান্ ।

জাপটে ফাপটে ধরাটা একেধরণের দেখনদারি বা ভন্ডামি বলেই ইরার মনে হয় । ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে থেকে যাকে শান্তি দেবে তাকে ফিজিক্যালি জাপটে ধরার কোনো মানে হয়না । এগুলি ইরার দর্শন যাকে মজা করে শিরিষ বলে : ইরা পুরাণ ।

আর ওঁর, মানে মহেশ্বরী বা মীনা মাদারের সান্নিধ্য ইত্যাদিতে সবাই শান্তি পান । নারকোটিক ড্রাগস্ থেকে মুক্তি পেতে গেলে নানান উইথড্রয়াল সিম্পটম্স্ দেখা যায় । খুব অসুবিধে হয় লোকের । সহজে এই ড্রাগস্ ছাড়া সম্ভব হয়না । লোকে অল্প থেকে তীব্র হ্যাবিটে জড়িয়ে পড়ে ।

সেই চক্রব্যূহ্য থেকে বার করা খুবই সহজ এখন । মহেশ্বরী মাদারের সামনে ঘন্টা খানেক বসে ধ্যান করলে মনে আসে এক শান্ত ভাব ।

আবার যাদের মনের ব্যামো আছে, তারা -ওষুধে কাজ হয়না বলে আরো বেশি মনব্যাধির কবলে পড়ে যায় । কিন্তু মহেশ্বরী মায়ের সংস্পর্শে এলেই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় ।

কাজেই ইরা ভাবে : নে কামিয়ে নে, ফুটো ভারতের সংস্কৃতি ছড়িয়ে আর রিয়ল সেন্টদের টিচিংস্ মুখস্থ করে ,তার বেণু বাজিয়ে । তোতা পাখির মতন ।

যত পথ তত গুলো মত, আই অ্যাম দ্যাট এর নকলে : ইউ আর দ্যাট ।

এইসব আর কি ।

কাজেই ও সেখানে যেতে অনিচ্ছুক সেটাই ভদ্রভাবে জানিয়ে দেয় বৃদ্ধা ক্লায়েন্ট ও তার নাতি ডোরি নামক মৎস্যকে ।

ফোনে জুনিরাকে এইসব গল্প বলে । জুনিরা বাস্তববাদী । বলে ওঠে : আরে একজন্মে কি কারো মোক্ষম্ হয় ? হয়না । কোথাও তো শুরু করতে হবে । আর এদের যা সমস্যা তা হয়ত মহেশ্বরী ভালোভাবেই সলভ্ করে দিচ্ছেন কাজেই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন উনি ।

একটা জিনিস অবশ্য খুব দৃষ্টিকটূ নয় দৃষ্টিনন্দন । মহেশ্বরী মায়ের অনেক ভেড়া আছে । ফার্মহাউজে থাকেন স্বামীর সাথে । স্বামী লোকাল সাহেব । সন্তান নেই কোনো ওদের । তো এই সাধ্বী ,ঐসব মেষশাবকদের নিজের সন্তানের মতনই লালন পালন করে থাকেন । আর দীক্ষা দেবার জন্য উনি কোনো অর্থ দাবী করেন না । ফ্রি-তে দীক্ষা দেন । মহিলা নাকি কথাই বলেন না । ওর কাছে গেলেই একটি বৈদ্যুতিক শক্ এর মতন লাগে । শিহরিত হয় সমস্ত চেতনা ।

নীরবতা কথা বলে । মানুষ পবিত্র হয় । হয় মুগ্ধ ।

জুনিরাই পরামর্শটা দিলো : যাহ্ না । দেখেই আয় । কী আর হবে ? আর কিছু না হোক্ একটু শান্তি পাবি । ফ্রিতে । ফ্রিতে কে আর কী দেয় এই দুনিয়ায় আজকাল । একা একা কী করবি ঐ বরফ রাজ্যে ?

ইরা ভেবে দেখলো প্রস্তাবটি মন্দ নয় । দেখাই যাক্ না । অ্যাট লিস্ট কিছুটা মজা দেখা হবে ।

ওর ক্লায়েন্ট, বৃদ্ধা মেম ওকে দুটি ভারতীয় রান্না করে খাইয়েছেন । ওর এক বান্ধবীর কাছে শিখে এসেছেন, ইরা এখানে এসে থাকবে শুনে । সাহেবদের এই **Resilience** ইরাকে খুব আনন্দ দেয় । ওরা নতুন নতুন পন্থা আবিস্কার করে জীবনকে করে তোলে মধুময় । ওদের ঘা খেয়ে ফিরে আসার ক্ষমতা সত্যি অপূর্ব । ভদ্রমহিলা এত বুড়ো , প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছেন উনি --তবুও নতুন করে অন্য মুলুকের রন্ধন প্রণালী আয়ত্ত্ব করে আবার নতুন জীবনের স্বাদ নিতে চাইছেন । কোনো বাধাই যেন এদের কাছে বড় নয় । এসব ইরাকে মুগ্ধ করে ।

এরা সবাইকেই সুযোগ দিতে আগ্রহী । সবাই তো মানুষ কাজেই দোষগুণ সবার ভেতরেই থাকবে । তবুও দোষ থেকে গুণ এক্সট্র্যাক্ট করা কিংবা হার না মানা অ্যাটিটিউড্ ইরার ভালোলাগে ।

একটি লোকাল কলেজে ভারতীয় ছাত্র, পাকিস্তানি ছাত্র , চৈনিক ছাত্রছাত্রী বিদ্যাভ্যাস করে থাকে । সেখানে টয়লেটে কমোড বলে অনেকের খুবই অসুবিধে হয় । অনভ্যাসের ফলে । কতৃপক্ষ ওখানে সুবিধের জন্য সার দিয়ে অনেকগুলি ইন্ডিয়ান ধাঁচের টয়লেট তৈরি করে দিয়েছেন । কারণ কিছু ছাত্র, ছাদে দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়িতে হ্যান্ডেল ফিট্ করে কমোডে কেমন ঝুলন্ত অবস্থায় বসতো । সার্কাসে দেখা ট্রাপিজের খেলার মতন কিছুটা । আবার হাসপাতালে ইস্টার্ন খাবারের কাফে আছে । যারা ভীনদেশী তাদের জন্য । মাঝে যখন অস্ট্রেলিয়াতে রেসিজমের ঘটনা

দেখা দিচ্ছিলো আর অনেক ভারতীয় আক্রন্ত হয়েছিলো তখন ভারত থেকে নানান মাধ্যমে বলা হয় যে *অস্ট্রেলিয়ানদের বক্তব্য হল ইন্ডিয়ানরা ওদের দেশের কালচার মেনে চলতে ইচ্ছুক নয় । কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আবার কালচার কী ? একটা ক্রিমিন্যালদের জায়গা । বৃটিশ অপরাধীদের চারণভূমি ছিলো ওটা । ওদের আবার কালচার কী ?*

এইসব রথী-মহারথীরা ইরার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন । প্রথমতঃ অস্ট্রেলিয়ায় শুধু অপরাধীরা থাকতো কথাটা বেঠিক । এখানে অনেক অফিসারেরা থাকতো, অপরাধীদের পাহারার জন্য । তাদের পরিবার ছিলো । আরো অনেক অ্যাডমিনের মানুষ ছিলো । ছিলো এখানকার লোকাল আদিবাসী, যাদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতি আছে । এছাড়া অনেক পর্যটক এখানে এসে থিতু হয়, এই জায়গার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে । তারা বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ । অন্যান্য দেশ থেকে রিফিউজি হয়ে বহু মানুষ আসে । আসে ইউরোপের শীত ও বরফ সহ্য করতে অক্ষম অনেক মানুষ যাদের চিকিৎসক ইত্যাদি পরামর্শ দিয়েছিলো কোনো গরম জায়গায় চলে যেতে । যেহেতু এটা সাহেবদের দেশ তাই ইউরোপের অনেক মানুষ তখন এখানে চলে আসে, পাকাপাকি ভাবে । এসেছে সিংহলি মানুষ আর খনি আবিস্কৃত হবার পর লক্ষ লক্ষ চৈনিক মানুষ । কাজেই শুধু ক্রিমিন্যালের চারণভূমি কথাটা একেবারেই অসত্য । আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় তবুও কিন্তু অপরাধীর ভূমি থেকে মাত্র কয়েক শো বছরে সাহেবরা এটাকে দুনিয়ার প্রথম সারির দেশে পরিণত করে ফেলেছে ।

এখানে মানুষের অসুখ হলে, এক পয়সাও খরচ না করে- দেশের সবচেয়ে ব্রিলিয়্যান্ট সার্জেনকে দিয়ে পরিচ্ছন্ন আধুনিক সুবিধে সহ

হাসপাতালে অস্ত্রপচার করানো যায় । এখানে ক্যান্সার হলে, সরকার অনেক ক্ষেত্রেই বহুমূল্য ওষুধগুলি স্পনসর করে থাকেন ।

সবচেয়ে বড় কথা এখানে মানুষকে মানুষের মতন দেখা হয় । গরুছাগলের মতন নয় । তা একটি দেশ যদি অপরাধীদের দেশ হয়েও এত উন্নতি করে ফেলতে পারে তাহলে ভারত এত স্পিরিচুয়ালি ও কালচারাল ভাবে এগিয়ে থেকেও দুনিয়ার দরবারে এখনও এত পিছিয়ে কেন ? কোনটা ভালো তাহলে ?

নিজেদের জাত ভাইদের বলুক বাইরে এসে ভদ্র সভ্য ব্যবহার করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে । অন্য দেশকে ক্রিমিন্যালদের চারণভূমি বলে নীচু না করে ।

বলভদ্র নামক এক ব্যাক্তি যিনি ৪০ বছর ধরে বিদেশে আছেন তিনি বলেছিলেন :: দু:খের বিষয় হল আমরা তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা সাহেবদের ভালো জিনিসগুলো শিখিনা , শিখি ওদের মদ খাওয়া , এন্তার সেক্স করা আর ড্রাগ্‌স্‌ করা অথবা ডাইভোর্স এর শিথিলতা ।

ওদের ভদ্রতা , কমপ্যাশন , স্ট্রেট ফরোয়ার্ড স্বভাব -এগুলো আমাদের পীড়া দেয় । কারণ আমরা শিখতে আসিনি তো , এসেছি লুটতে । যারা শিখতে আসে তারা অনেক এগিয়ে যায় । অনেক নতুনত্বে ভরে ওঠে ওদের চেতনা । পান্না বৃষ্টি হয় মনের অবচেতনে । তারা নতুন সুরে নিজেদের গেঁথে ফেলে । আর আমরা এসেছি- ইন্ডিয়ান সেলিব্রিটিকে আমার মধ্যবিত্ত বাড়িতে তুলে তাই নিয়ে গলা বাজাতে । দেশে তো কোনো সেলিব্রিটি পাত্তা দেয়না । বিদেশে এসে সংযোগ ঘটে । তারপর

সাহেবদের দেহ প্রদর্শনের গুণটা আয়ত্ব করে নিয়ে, অর্ধনগ্ন হয়ে- শিলা কি জাওয়ানি গাইতে গাইতে (সেই শিলার বানান শুরু হয় খ দিয়ে আর শেষ হয় ম-তে ঋকার ও হ্রস্ব -ই দিয়ে । অবাক হবার কিছু নেই সবই নিউমোরোলজির খেল । **শিলা= খবীফ্ড্ডীসইইইল্ল্লামি্----**

অত্যন্ত অশ্লীল ভাবে, নিজ হাতে নিজ স্তনযুগল পাক্ড়িয়ে করি পদ্মবনে মত্ত হাতীর মতন উদ্দাম নৃত্য । মুন্নি বদনাম হুয়ি ---টিংকু হামারা সিনেমাকা দিওয়ানা , জোর জোর্সে গায়ে গানা ---মাধুরী ভট্টাচার্য , মালাইকা অরোরা , ক্যাট্রিনা কাইফ্ ইত্যাদিদের অনুকরণ করে হতে চাই মনোলোভা । ওদের মতন গ্ল্যামার আর গ্রেস তো নেই -কাজেই সবই মাটি হয়ে যায় । নৃত্যশিল্প তো অনেক দূরে , একটা আইটেম সং-ও হয়না এগুলো ।

সেলিব্রিটির পদলেহন করতে থাকি নিজের আত্মসম্মান, ইন্টিগ্রিটি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে । তারপর কোনো সুবিধে বাগাতে না পারলে চলে তাদের মুন্ডপাত । ঝানু বিখ্যাতরা সুবিধে নিয়ে কেটে পড়েন , কাজে কাজেই।

পুজোর নাম করে একটি আড্ডা হয় । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব ভক্তদের, ঈশ্বরের প্রতি কোনো আকর্ষণ বা ভক্তি থাকেনা । একটা জটলা হলে দিব্যি মদ খাওয়া যাবে । কাজেই উপলক্ষ্য হল পুজো । পেটুক বং (বাঙালী)রা আবার একই পুজো- তিন ক্লাবের জন্য তিন সময়ে করেন যাতে কোথাও খানাপিনা মিস্ না হয় ।

সেই ওগো বধূ সুন্দরীর গান মনে পড়ে যায় :

এই তো জীবন , যাক্ না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ

বেয়াড়া , লাগাও ফোয়ারা --জিন শেরি শ্যাম্পান রাম্ --

লোলা লুলু , তোমার বয়স কেন হয়না ১৬ আর আমার নায়েন্টিন্ --

এই গান আদতে কলকাতার হাই সোসাইটির জন্য নয় এই গান স্বদেশী থেকে বিদেশী হতে চাওয়া মানুষের জন্য । শর্ট স্কার্ট পড়লেই কেউ মেম হয়না । সে এক দাঁড়কাকের সাধ হল কোকিলা সাজিতে--কেস আর কি ।

আরেক ব্যাক্তি তার নাম সুষেণ বন্দোপাধ্যায় ,সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন : ইন্ডিয়ার করাপ্ট সোসাইটি থেকে আসে বলে কিনা জানিনা -এদের মাইন্ড আর কাল্চার পুরোপুরি করাপ্ট হয়ে যায় ।

সুষেণবাবু আবার পরবাসে প্রায় ২৫ বছর আছেন । ঝানু গোয়েন্দা এখানে । পেশায় । নেশায়ও ।

এঁরা আবার এখানকার একটি ক্লাসের নাম দিয়েছেন:: **নেড়ি এন আর আই ।** এরা আদতে নেড়িকুকুরের মতন স্পিসিস্ । অনাদৃত , অবাঞ্ছিত । বরের ঘাড়ে চেপে এখানে আসে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুরূপা হয় । পার্টিতে, হাতে মদের গ্লাস নিয়ে ইন্ডিয়ানদের মুন্ডপাত করা , হেয় করা শুরু করে । যুবকেরা মিডিল ফিঙ্গার তুলে দেখায় । বলে : বস্ এটার ওপর এসে ।

স্বামীকে বিশ্বাস করেনা কারণ এখানে পরকিয়া আর ডাইভোর্স বেশি ।

তাই প্রতি পার্টি, যাকে এরা আসর বলে সেখানে ডায়লগ দেয় : আমাকে অমুকে বলেছে আমি রাজকন্যে , সুচিত্রা সেইন্, গ্রেস প্যাট্রিসিয়া কেলি , কেটি হোমস্ ---অ্যাম আ বিউটিফুল ইয়ং ওম্যান ।

ইরা ভাবে : আরে সবাই তো মানুষ । দোষগুণ সবার মধ্যেই আছে । আর সেলিব্রিটিদের গড বানায় কমন ম্যান । ওরাই এদের আকাশে তোলে আবার ফেলে দেয় । ওদের ইম্পার্ফেকশান নিয়ে চর্চা করে কোনো সুবিধে সাধারণ মানুষের হবেনা । বরং সুমধুর-গুণগুলি নিয়ে ভাবলে মনটা ভালো হয়ে যাবে । কিছু শেখাও যাবে ।

এইধরণের মানুষেরা কারো সার্টিফিকেটের জন্য বসে নেই । তাঁরা যা করে দিয়ে গেছেন সেটাই শিক্ষণীয় । দোষে গুণে মানুষ । সবার পজিটিভ আর নেগেটিভ রয়েছে । কোনো কিছুই পার্ফেক্ট নয় । কোনো সাবজেক্ট বা কাজ পার্ফেক্ট হয়ে গেলে তারপরে আর কিছু করার থাকেনা । তাই খুঁত সবকিছুতেই থাকবে । আর সেটাই জীবনের আনন্দ । অন্য কেউ আসবেন যিনি সেই খুঁত ঢেকে নতুন জিনিস করে দেখাবেন । এইভাবেই দুনিয়া সার্কাস চলে । সব পার্ফেক্ট হয়ে গেলে দুনিয়ায় কোনো মুভমেন্ট থাকবে না । কাজেই ওদের দোষ খুঁজে, তাই নিয়ে চর্চা করা- যে করছে তাকেই ছোট করে । হয় ঈর্ষাকাতর -তোমার হয়েছে আমার হচ্ছে না অথবা নিতান্তই ছোটমানুষী ও কুটিল মন ও স্বভাবের প্রকাশ । ওদের কাজের কনস্ট্রাকটিভ্ ক্রিটিসিজম্ করতে হলে একটি পরিচ্ছন্ন মন দরকার । আমাদের উচিৎ বড় বড় জ্ঞানী গুণী মানুষের সমালোচনা না করে ওদের পজিটিভ থেকে শেখা । সাধারণ মানুষের জন্য এটাই মনে হয় সবচেয়ে ভালো রাস্তা । হ্যাঁ ,সেই ব্যাক্তি যদি ক্রাইম করে , নষ্টামি করে , অতিরিক্ত ইগো দেখায় তখন তাই নিয়ে সোচ্চার হওয়া চলে কারণ জগতের সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম হল মানব ধর্ম ।

কাজেই দর্শন হল : লিভ অ্যান্ড লেট লিভ । সেই ইরাপুরাণ !

ইরা খুব লম্বা লম্বা দর্শন দেয় -- আর লিপিবদ্ধ করে মনে মনে সেই ইরা পুরাণে--- শিরিষ গাছের বল্কল নিয়ে তাতে দোয়াত কালি দিয়ে কখনো কখনো গেঁথেও ফেলে।

এই বৃদ্ধা মেম- যিনি ওর ক্লায়েন্ট হয়েও মাতৃসমা , তিনি কিন্তু নিজে রোজ রান্না করেন না । পুরো মশলা ও রেসিপিসহ প্রতিদিন ওর হেঁশেলে টাট্‌কা সবজি ও মাংস , মাছ ইত্যাদি সাপ্লাই হয় একটি সংস্থা থেকে । কম খরচে ওরা প্রতিদিনের খাবার প্যাক করে বৃদ্ধ, অসুস্থ আর যারা সময় অভাবে রন্ধনে অনিচ্ছুক তাদের বিক্রি করে । তবুও শিখে নিয়ে চুল্‌হা ধরিয়ে, অনভ্যস্থ হাতে বুড়ি, ইরাকে যে দুটি ভারতীয় ডিশ খাওয়ালেন সেগুলির একটা হল স্যমন মাছের খুবই সোজা একটি রান্না ।

স্যমন মাছে হলুদ, নুন , টমেটো কুচি , পেঁয়াজ , রসুন ,আদা আর ধনেপাতা দিয়ে বেশ ভালো করে মেখে সারারাত রেখে দিতে হবে ।

পরের দিন মিনিট ৬ মতন মাইক্রো ওভেনে দিয়ে কুক করতে হবে ।

তারপর বার করে নিয়ে সর্ষের তেল ছড়িয়ে একটু উল্টে পাল্টে নিয়ে যাতে তেলটা বেশ ভালো করে মিশে যায় (একটু বেশি করে দিতে হবে) আবার মাইক্রোতে মিনিট পাঁচেক কুক করুন । খেয়াল রাখতে হবে যেন মাছটা ভেঙে না যায় । খুব নরম মাছ কিনা !

খেতে অসাধারণ হয়েছিলো । ও আবার ভাত দিয়ে মেখে খেয়েছে ।

ভদ্রমহিলা ভাত রান্নাও জানেন । রাইস কুকারে করেন না আর ফ্যান গালেন না । গরম ভাতের গন্ধ তবুও মন মাতায় ।

বলেন :: অ্যাক্চুয়ালি আই পুট লেস ওয়াটার ইন ইট ।

এই গোলাপী মৎস্য ডিশ, যেকোনো কাঁটা বিহীন মাছে ভালো লাগলেও স্যমন , বারামুন্ডি (ভেট্কি) , তেলাপিয়া এগুলিতে ভালো খোলে ।

অন্যটা চিকেনের আইটেম । এটাও খুব সহজ রান্না । অতি সোজা ।

চিকেন লেবু আর নুন হলুদ দিয়ে মেখে ঘন্টা চারেক ম্যারিনেট করুন । তারপরে যেকোনো হাল্কা তেলে মেথি ফোড়ন দিয়ে চিকেন ভেজে নিন । অল্প ধনে গুঁড়ো , টমেটো কুচি , নুন, হলুদ ও এককোঁটা মিষ্টি আর ক্যাপসিকাম বড় বড় করে কেটে মিলিয়ে দিয়ে বয়েল করে নিতে হবে । নামাবার আগে ছড়িয়ে দিন কাঁচা লঙ্কা । চিরে নিয়ে ।

কচি গাজর দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা নিজের মন থেকে । বেবী ক্যারট । খেতে চমৎকার হয়েছিলো ।

মেম বুড়ি বলেন ::: দেখো ডিয়ার বেশি কমপ্লিকেটেড্ ইন্ডিয়ান রান্না তো আমি পারিনা । এগুলি সহজ বলে করেছি । খেয়ে বলো কেমন হল !

সত্যি ভালো হয়েছিলো । আর ইরার কাছে খাবারের স্বাদই আসল । কতটা তেল ঝাল মশলা পড়ছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ।

কথায় বলে ,ভালো শেফেরা হাত ধোয়া জল দিলেই খাবারের স্বাদ হয় আর যারা পোড়া ওমলেট্ ভাজতে অভ্যস্থ, তারা যতই মশলা দিক না কেন- স্বাদ হয়না খাবারে ।

প্রতিটা মশলা , ফোড়ন আর সবজি, মাছ ইত্যাদির নিজস্ব স্বাদ আছে ।

আজকাল যেমন সব মিশিয়ে রান্না করে সেগুলি ইরার ভালোলাগে না ।

যেমন অনেকে ঢাল রান্না করেন মানে ডাল আরকি -সেরকম । কালোজিরে ফোড়ন একরকম আর পেঁয়াজ দিয়ে আরেকরকম হয় । কিন্তু অনেকে ঐ ঢালে একসাথে অনেক ফোড়ন আর গাদাখানেক কেনা মশলা দিয়ে একটা খিচুড়ি করে আনে । সেগুলি ইরার মোটেই পছন্দ হয়না । অখাদ্য মনে হয় । এই মেমসাহেব আন্তরিকভাবে সহজ রান্না করেছেন । ইরার সত্যি মনে হয়েছে যে এই খাবার এক অসাধারণ মেসেজ বয়ে আনছে । মেসেজ হল : মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও ভালোবাসা । সেইজন্যেই এত পরিশ্রম করে, অচেনা এক ভীনদেশী মেয়ের জন্য রান্না করা আর সেই কারণেই সহজ রান্না হলেও ইরার এত ভালোলাগা --হৃদয়ে তোলপাড় ।

কেকা ফিরদৌসী, বাংলাদেশের একজন সেলিব্রেটেড্ শেফ । রান্না নিয়ে গবেষণা করেছেন অনেক । উনি কেবল একজন ব্রিলিয়্যান্ট শেফ্ নন একজন ফেনোমেনাল মানুষ । ইরা ওঁর রন্ধন প্রণালীর বিশেষ ভক্ত । কারণ অত্যন্ত সহজ উপায়ে তৈরি করা , পুষ্টিকর খাদ্যও যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা কেকা দেবীর রেসিপি, ইউ-টিউবে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত । সাধারণত যেসব খাবার পুষ্টিবর্ধক সেগুলি খেতে অখাদ্য হয় ।

মেম বুড়ির রান্না নিয়ে এই চ্যাপ্টার, বলা হয়ে গেছে জুনিরাকে । সে বলে : শুনে লোভ লাগছে । দা লেডি হ্যাজ আ বিউটিফুল মাইন্ড অ্যান্ড ইজ ভেরি ভেরি জেনেরার্স ।

তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং ইরা পাড়ি দিলো মহেশ্বরীর বাড়ি । বিশাল ক্যাসেলের মতন বাড়ি । অট্টালিকা । আগে নাকি সাধারণ একটি ফার্মে ছিলেন । এখন এখানে থাকেন । এর আশেপাশেও বিরাট ফার্ম । নিজেরাই নিজেদের শস্যবীজ বপণ করেন , চাষ করেন । ভক্তরা এসে ঐ ক্যাসেলে কিছুদিন কাটায় । মাতাজী কোনো কথা বলেন না । ওঁর সান্নিধ্যই মানসিক ভাবে অসুস্থ রুগীদের শান্তি দেয় । ওষুধ ও কাউন্সেলিং ছাড়াই । যদিও উনি দীক্ষা দেবার আছিলায় কোনো অর্থ নেন না কিন্তু ওঁর ছবি, বই , পুতুল বিক্রি করে ওদের দৈব সংস্থা । ভক্তদের ফ্রি লাঞ্চ ও ডিনার দেওয়া হয় হয়ত এই রোজগারের অংশ থেকেই । ওঁর ক্যাসেল রূপী আশ্রমে দুবেলা খাবার দেওয়া হয় । অধ্যাত্মবাদের প্রথম সিঁড়ি হল মডারেশান ইন ফুড, স্লিপ অ্যান্ড ওয়ার্ডস্ ।

মহেশ্বরীর চেহারা খুবই সাধারণ । হয়ত বিয়ের বাজারে কুৎসিত বলাও চলে । কিন্তু চোখে এক আসাধারণ জ্যোতি ।

জ্যোতি স্বরূপিনী , আনন্দ সলিলা , অমৃতবর্ষিণী এক দিব্য্য ভৈরবী । ওঁর নীরবতা মধুক্ষরা । ঈশ্বর সায়লেন্ট । আমরা সবাই সায়লেন্স থেকে এসেছি আর একদিন সেই সায়লেন্সই মিশে যাবো । এই নাচ বা প্রলয় নাচন চলবে কিছু সময় মাত্র ।

এই দর্শনই যেন ক্যাসেলের আনাচে কানাচে । বাইরে থেকে ক্যাসেল হলেও অন্দর তার এক আশ্রম । আশ্রমিক নির্বাক -- ভালোলাগে নীরবতা । তাই আনন্দ নিতে রাশি রাশি মানুষ এই মহেশ্বরী মায়ের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন । বন্ধ হয়ে যায় সাইকো সোমাটিক ড্রাগ্স্ । কোকেন , এল এস ডি , ব্রাউন সুগার, হাসিস্ , হেরোইন সমস্ত চলে যায় গার্বেজ বিনে । এমনই এই আনন্দ ।

মহেশ্বরী দিব্য সত্যি । সি ইজ হোলি ।

ক্যাসেলটা খুবই সুন্দর করে সাজানো হয়েছে । মনে হবে, এটা ভারতের কোনো প্রাসাদ । নটরাজের বিরাট তাম্রমূর্তি এককোণায় ।

নানান ফুলের পাপড়ি ভাসমান সেই মূর্তির সামনে -একটি অপরূপ মাটির পাত্রে । চন্দন ধূপের সুবাস । স্মোক ডিটেকটর্ নাকি বিশেষ অনুমতি নিয়ে অন্যভাবে রাখা হয়েছে । সারাটা ঘরে প্রদীপের শিখা । সন্ধ্যায় মহেশ্বরী- ঘরের একদিকে পাতা মোটা গদির ওপরে এসে বসেন । সেই গদি একটি উঁচু কাঠের স্টেজের ওপরে । ঘরের অন্যান্য দিকে অন্য সব দেবতার মূর্তি । সবার কণ্ঠে অপূর্ব রঙের সমস্ত ফুলের মালা । গোলাপী , গাঢ় লাল আর সাদা , হলুদ আর গাঢ় কমলা । নীল ও আকাশি ফুলের মালা । খুব সুন্দর । এই আসরে কেউ কথা বলে না । মহেশ্বরী তো নির্বাক সাধ্বী । করো কোনো সমস্যা থাকলে কিংবা মনে কোনো প্রশ্ন ও কনফিউশান দেখা দিলে একটি মোমবাতি নিয়ে সোজা উঠে মাদারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে । তারপর পাশের একটি টেবিলে সেই মোম রেখে কিছুক্ষণ মহেশ্বরীর সামনে দাঁড়ালে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে ভক্তরা ।

তবে সাধ্বী কাউকে শিষ্য বলেন না । সবাই ওঁর ভক্ত । কানে মন্ত্র দিয়ে : কানের ভেতর ফিস্‌ফিস , বছর বছর আমায় দিস্ ,এরকম কোনো কেস এখানে নেই ।

একজন আজব মানুষের সাথে আলাপ হল । প্রলাপও হল । ওর নাম পিয়ূশ্ ড্যামি । জাতিতে ছিলো ডোম । ভারতে । পদবী ছিলো ডোমার হয়ত । পিয়ূশ্ ,গর্ব ভরে বলে যে সে আদতে একজন ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ । ওর বাবা ছিলো পালোয়ান । খুব লড়াকু আর শরীরের খুব যত্ন নিতো । উত্তর ভারতের এক রাজা তার রাজ্যপাট এক জার্মান সাহেবকে বিক্রি করে দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন । ছেলেপুলে নিয়ে । সেই জার্মান সাহেব এক দেশী রূপসীকে বিয়ে করেন । তখন বৃটিশ সরকার ছিলো । রূপসী, বাল বিধবা ছিলো -আর ঐ রাজ্যের সেনাপতির একমাত্র মেয়ে ছিলো । তাকে ছোরাখেলা , লাঠি খেলা , যুযুৎসু সমস্ত শিখিয়েছিলো তার সেনাধ্যক্ষ পিতা । জার্মান সাহেব ওরফে রাজার নেকনজরে পড়ে বিয়েটা করেই ফেলে রাণী মোহর । কিন্তু কোনো সন্তান হয়নি । পরে অন্য রাজ্যের হিন্দু রাজা -আক্রমণ করে জার্মান নরেশের রাজ্য ,ওড়নিডিহি । ওড়নাডিহি বলবো আমরা । নামটা চমৎকার , নয় কি?

সেই ওড়নাডিহি আক্রমণ করে, বিদেশী নরেশকে মেরে ফেলে হিন্দু রাজা । রাজ্যের অনেক মানুষ নিহত হয় । রাণী মোহরের রূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলো হিন্দু লম্পট রাজা হরপ্পাদিত্য । কাজেই তাকে নিজের পাটরাণী করার মতলবে হানা দিয়েছিলো এই রাজ্যে । যুদ্ধে জয়লাভ করে মোহরের দেহলতার স্পর্শ পেতে উদ্যত হয় হরপ্পাদিত্য ।

সেইসময় পিয়ূশের পিতা -পালোয়ান ঘাইরাম যে মহারাণীর একজন পরম বিশ্বাস ভাজন ছিলো, ওদের এলাকার এক জাদুকরের সাথে হাত মিলিয়ে বিদেশে পলায়ন করে মোহরকে সুরক্ষিত করেই। জাদুকর আবার সাহেব রাজার নেকনজরে পড়ে অনেক আগে থেকেই বিদেশে জাদু দেখাতে

যেতো । কাজেই ঘাইরাম, রাণী রূপবতী মোহর আর জাদুকর তিনজন পাড়ি দেয় বিদেশে ।

জাদুকরের দুই সাথী অন্যত্র লুকিয়ে পড়ে । ওদের মতন পোশাক পরে , মুখোশ পরে ঘাইরাম আর রাণী মোহর রাজ্য ছাড়ে গাঢ় অমাবস্যার সময় ।

জাদুকরের দলের অন্য দুজনে পরে অন্য পথে বিদেশে পাড়ি জমায় ।

এখানে এসে মোহরের জীবনের উদ্দেশ্য বদলে যায় ।

জাদুকর নিশান্ত বজ্রশ্রেষ্ঠা তখন ওদেরকে তার এক পুরনো দর্শকের সাথে আলাপ করিয়ে দেয় । বহুদিন যাবৎ তো পরবাসে ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে বজ্রশ্রেষ্ঠা । বাজি শ্রেষ্ঠ বলাও চলে ওকে । যাইহোক্ তার কল্যাণে একটি ফার্মে ঠাঁই পেলো মোহর আর ঘাইরাম ।

মোহর সেখানে উলের পোশাক বুনে রোজগার করতো । বুড়ো সাহেব আর বুড়ি মেম সেই পোশাক নিয়ে শহরে বিক্রি করতো । অনেক লাভ হত কারণ মোহরের হাতের কাজ নিঁখুত আর সৌন্দর্য্যে ভরপুর ।

শীতের দেশের মানুষ মুখিয়ে থাকতো পরের উলের পোশাকটির জন্য । অভিনব ডিজাইন সেইসব পোশাকের । রাজমহিষীর হাতে বোনা পোশাক বলে কথা ! আর ঘাইরাম ফার্মে গতর খাটাতো । পরে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে যায় দেশ থেকে । ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে ।

কাজেই ছেলেকে জ্যান্ত খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি । বৌ আগেই গত হয়েছে । ছেলে পিয়ূশ্ চলে আসে সুদূর এই দেশে ।

এখানে ঐ ফার্মের বুড়োবুড়ি ওকে লেখাপড়া শেখায় । হয়ত বিরাট নামীদামী স্কুলে সে যায়নি কিন্তু যা শিখেছে তা -জীবনকে অন্যভাবে উপভোগ করতে শিখিয়েছে । যেহেতু ওরা জাতিতে ডোম ছিলো তাই ওদের ফার্মের কাছে ,ওরাই সর্বপ্রথম একটি হিন্দু ফিউনেরাল হোম খোলে যেখানে হিন্দুদের পোড়ানো হয় সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই ।

আগে হিন্দু কেউ মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হত । এলাকায় কোনো চিতা জ্বালানোর সুব্যবস্থা না থাকায় । এক ফিউনেরাল ডাইরেক্টার ধরা পড়ে একদিন । সে করতো কী হিন্দুদের দেহ নিয়ে কফিনে পুড়ে দিতো।

কিন্তু কবর খুঁড়ে পড়ে দেখা গেছে যে আদতে শুধু কফিনগুলো পোঁতা হত । হিন্দু মৃতদেহ চালান হয়ে যেতো ,যারা মড়া নিয়ে কাজ করে তাদের ডেরাতে । কারো সন্দেহ হওয়াতে কবর খুঁড়ে এই অভিনব তথ্য মেলে । লোকটির হয়ত শাস্তি হয় । তাই চিতার ব্যবস্থা করতেই হিন্দু মানুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো ওদের ফিউনেরাল হোমে।

পিয়ূশের বাবা, নিজ ডোমের কাজ তো অনেক আগেই ছেড়েছিলো । যখন ঐ জার্মান রাজা ওকে হরিজন-চন্ডাল পল্লী থেকে তুলে এনে নিজের বডিগার্ড নিযুক্ত করেন সেই তখন থেকে। রাজা ভদ্রলোক বেশ কিছু সোসাল রিফর্মে অংশ নেন - দেখা যাচ্ছে ।

তখন থেকে পিয়ূশের পরিবার মূল ব্যবসা থেকে দূরে চলে আসে । কিন্তু এখানে ফিউনেরাল হোম খুলে আবার জাঁকিয়ে বসে, হৃদয়ের কোণায় চিতা জ্বালানোর সমস্ত এক্সপার্ট টুলস্ থাকায় ।

মহেশ্বরী মাদার এই প্রৌঢ় পিয়ূশকে শান্তি দেন ।সেই শান্তি পিয়ূশ ,প্রতিটি মৃতদেহের ললাটে এঁকে দেয় তাদের শেষশয্যায় শোয়ানোর আগে । কোলাজ পিয়ূশ , ফার্স্ট ক্লাস ।

এই অদ্ভুত ভালো লোকটা ইরাকে জিজ্ঞেস করে বসলো : আপনাকে যদি আমি ডিনারে ডাকি , আপনি আমার হাতে খাবেন তো ? আমি হরিজন বংশভূত বলে আপনার ঘেন্না লাগবে না ?

ইরা প্রথমে ওর মুখে এই আজব কথা শুনে একটু অবাক হয় । পিয়ূশের নিজের জাত নিয়ে কোনো হীনমন্যতা নেই বলেই আরো অবাক হয় ।

পরে হেসে বলে ওঠে : তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো , তোমার হাতে আমি সত্যি সত্যি খাবো । হোটেল রেস্তোরাঁ এইসব জায়গায় গিয়ে কবজি ডুবিয়ে খেয়ে আসি । তখন কি শেফের জাত জানতে চাই না সে বলবে আমাকে ? জিজ্ঞেস করলে ঘাড়ে ধাক্কা মেরে বার করে দেবে আমাকে হোটেল থেকে -আর সেটা অনুচিত বা অন্যায় হবেনা ।

পিয়ূশের নিজ প্রফেশন নিয়ে গর্ব আছে বটে ! বলে :: আমরা তো সমাজের ময়লা সাফ করি । শকুনদের মতন । আমরা কাজ না করলে কত পচাগলা দেহ জমে থাকতো সর্বত্র তা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ব্রাহ্মণ মানুষ যা পারেনা আমরা সেইসব কাজ করে সোসাইটিকে রক্ষা করি ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাসের থেকে । ব্রাহ্মিন্স শ্যুড রেস্পেক্ট আস্ । উই ডিসার্ভ লাভ, নট হেট্রেড্ । **আমরা সমাজের অ্যান্টি সেপটিক্** ।

ইরার এক পরিচিত একবার বলেছিলো : লো কাস্ট , প্রবাসী বাঙালী আর মেরো , উড়ে -এদের হাতে এক গ্লাস জল খেতেও আমার অত্যন্ত ঘৃণা হবে ।

কেন প্রশ্ন করায় সে বলে : কারণ ওরা নিকৃষ্ট শ্রেণী । ওদের মেরে শুইয়ে দেওয়া উচিৎ ! একটা উড়ের হাতে তো আমি জল খেতে পারিনা !

ওর পরিচিত একটি পরিবার, বাড়ির লো কাস্ট ঝি- বাসন মেজে গেলে আবার গরম জলে সব ধুয়ে নিতো । আরেক পরিবার এতই উন্নাসিক যে পাশের বাড়িতে এক কায়স্থ পরিবার থাকতো বলে বাগানে মেলা জামাকাপড় যা কিনা ঐ কায়স্থ বাসার দিকে সেগুলি লম্বা লাঠি দিয়ে তুলে আনতো । স্নানের আগেই জামাকাপড় মেলে দিতো। তারপর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে লাঠি ব্যবহার করতো- কায়স্থের ছায়া থেকে পোশাক সরানোর জন্য । ওদের বাড়ির ছেলেপুলেরা ওদের কত্তামশাইদের কাছে শুনতো যে লো কাস্টের সাথে ওঠাবসা করা অনুচিত ।

লো কাস্ট কারা? জিজ্ঞেস করলে বলা হত - তারা কারা ।

তখন কিশোর কিশোরী জানতে চাইতো সরল চোখে : আচ্ছা , লো কাস্টরা কি কায়স্থদের থেকেও নিচু ?

আরেক মহিলাকে চেনে যে নিজে মুখোপাধ্যায় তাই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ব্যাতীত বিবাহে অরুচি । ওসব লো গোত্রের ব্রাহ্মণ অবধি অচল ওর কাছে । শেষমেশ এক চট্টোপাধ্যায় বর জোটালো । কিন্তু সে মদ্যপ, লম্পট আর অলস । আগে একটি কায়স্থর সাথে যোগাযোগ হয় । সাধারণ চাকুরে । ভদ্রসভ্য । তাকে বিয়ে করা অসম্ভব স্রেফ তার পদবীর জন্য । অথচ মানুষ হিসেবে সে আসে একদম প্রথম সারিতে । লোকটির নাম প্রিয়দর্শী সেন । সেন কায়স্থ খুব কম হয় - বৈদ্যি বেশি হয় । বাসুকি গোত্র ছিলো এদের -মানে প্রিয়দর্শীর ।

তবুও চট্টোপাধ্যায় ---! এখন চপটাঘাত ; দিবানিশি --চট্টোর চটি নয় খড়ম্ থেকে ।

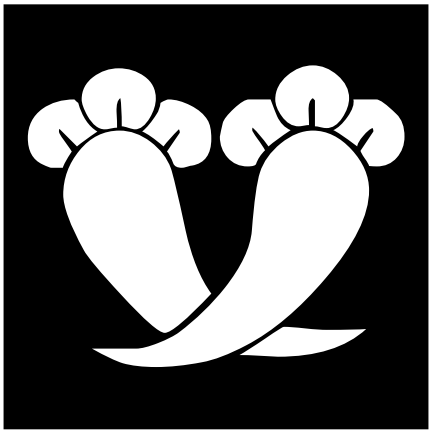

চটপট সব ছবি তুলে পাঠালো জুনিরাকে । তারপর জুনিরার উত্তর পেয়ে চমকিত ইরাবতী । জুনিরা ইমেলে লিখেছে যে মহেশ্বরীর হিস্ট্রি কী ? কোথা থেকে এসেছেন ? ভারতের কোথার থেকে ? কবে ?

ইরাকে খোঁজ নিতে বলছে জুনিরা । কারণটা অত্যন্ত অদ্ভুত । এই জ্যোতি স্বরূপিনীকে নাকি একেবারে ওদের মৃতা দ্বীপবাসিনী পুঁচকির মতন দেখতে । **মুখ চোখ নাক** এমনকি নয়নমণির রং-টাও এক । এক চুলের ধাঁচ আর হাসি । দাঁতের গঠন । পুঁচকির কোনো যমজ বোন তো নেই । আর ওর হাসিটা খুব সুন্দর ছিলো । কথাও মোটে বলতো না- যেমন মহেশ্বরী করে থাকেন । কাজেই একটু ইনভেস্টিগেট্ করা দরকার ।

যদিও ইরা যখন লিখলো যে পুঁচকি তো মারা গেছে , ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ওর পরিবার তখন জানতে পারলো যে মৃতদেহ কেউ দেখেনি ।

যেই বাক্সে ঘুমাতো সেখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । হয়ত সন্ন্যাসী রাজার মতন ঘটনা !

পুঁচকির বাবা, মেনল্যান্ডে অর্থাৎ ভারতের এক নামজাদা মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন । একমাত্র মেয়ের খুব ছোট বয়সে বিয়েও দেন । কিন্তু ভাগ্য দোষে সে বাল-বিধবা হয়ে দিন কাটাতে থাকে । পুরোহিত মহাশয় মারা গেলে ওর একমাত্র ছেলে ও তার বৌ, পুঁচকিকে অসম্ভব যাত্না দিতে শুরু করে । ছেলেটি খুব স্বার্থপর । নিজের আখেড় গুছানো ছাড়া কিছু বোঝে না । বৌটিও সেরকম । আর ছেলেটি খুব ছোটবয়স থেকে বাড়ির জিনিস বিক্রি করে নিজের নানান স্বাদ আহলাদ মেটাতো । বাড়ির লোকের অগোচরে । পুরোহিত তো ভালই মাইনে পেতেন । এছাড়া বড় মন্দিরে কাজ করেন বলে কলাটা , মূলোটা ভালই আমদানি হত । কাজেই ওদের বাড়িতে অনেক জিনিস কেনা হত স্বাভাবিকভাবেই । ছেলেটি মেনল্যান্ডে পড়তে গিয়ে নাকি বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে ব্রথেলে যেতো নিয়মিত । একবার তো মায়ের আর ওদের কূলদেবতার সমস্ত গয়না নিয়ে হাওয়া হয়ে যায় । আর পড়াশোনাতে ছিলো লবডঙ্কা । ফেল করে করে শেষে কোনক্রমে গ্র্যাজুয়েট হয়, সোসাল সায়েন্সে ।

বাবার মৃত্যুর পরে পুঁচকিকে জ্বালাতে শুরু করে । ওর বাবা নাকি আদতে ওর জন্যেই মারা যান । হার্ট এর বিকলতায় । যখন জানতে পারেন যে ছেলে ব্রথেলে যায় আর পড়াশোনার থেকে তার কাছে অসৎ উপায়ে টাকা যোগাড় করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন পুরুৎ মশাই সহ্য

করতে পারেন নি । নিজের রক্তমাংস, এরকম এক পাষন্ডের জন্ম দিয়েছে দেখে ভদ্রলোক মরমে মরে যান ।

পুঁচকির জন্য একটা ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে সেটা সম্ভব হয়নি ।

এরকম চমকপ্রদ কেস পেলে কে না গোয়েন্ডাগিরি করবে ? বিশেষ করে এই মহেশ্বরী যদি রসিকলালের পুঁচকি হয় তাহলে তো কথাই নেই । তাই জোরকদমে নেমে পড়ে ইরা ।

নিজেকে মেলে ধরেন মহেশ্বরী , ভক্তদের সংলাপের মাধ্যমে । কিছু লুকায় নি পুঁচকি ।

খুব ছোটবেলা থেকেই সে অটোমেটিক ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে যেতো ।

খুবই ভক্তিমতী । সেজন্যই কতকটা পুরোহিত মশাই ওর শৈশবে বিয়ে দিয়ে দেন । কারণ পরে হয়ত আর বিয়ে করতে চাইবে না । যদি জ্ঞান হলে বেঁকে বসে তাই একপ্রকার রাতারাতি বিয়ে হয়ে যায় ।

ও যে ঘরের বাইরে শুতো তার কারণ ওর ধ্যানের অভ্যাস ।

যখন লোকে ওকে মৃতা ভাবে তখন আসলে পুঁচকি ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে । এত গভীর সেই ধ্যান যে কোনো বাহ্যিক হুঁশ ছিলো না । আর বহু যোগী শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারেন অনেকক্ষণ ধরে ।

ওকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় ওর পরিবার, মৃতা ভেবেই । তারপর ওকে তুলে নিয়ে যায় এক জলদস্যুর দল । তাদের নৌকোতে করে ।

মেয়েটি জীবিত দেখে ওকে নিয়ে ওরা পাড়ি দেয় সুদূরে । এবং একটি বিদেশী বাজারে বিক্রি করে দেয় ।

পুঁচকি এইসব কিছু গোপন করেনি । সেই বাজার থেকে ওঁকে কিনে নেন ওর স্বামী । ভদ্রলোক ভারতে এসেছিলেন স্পিরিচুয়াল টুরিস্ট হিসেবে ।

লখিমগড়ের-- সেই অখ্যাত কামাক্ষী দেবীর পরিত্যক্ত মন্দির সম্পর্কে একটি নামী বিদেশী চ্যানেলে ডকুমেন্টারি দেখেছিলেন । ওখানে একটি দৈবশক্তি আছে । কিন্তু মন্দিরটি এখন ভগ্ন । তবুও সেই মন্দিরের অন্দরেই মানুষ যায় । পুজো করে । নিজ খেয়ালে । কোনো নিয়ম নেই ।

কামাক্ষী দেবীর শিলা মূর্তি থেকে নাকি রক্তক্ষরণ হয় । আর কেউ দুধ বা চন্দন গোলা জলে স্নান করালে প্রাচীন এই মূর্তি পুরো জল শুষে নেয় । তবে অর্থ কম বলে নাকি দ্বীপটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিলো অনেক যুগ ধরে বলেই কে জানে এখানে এখন নিয়মিত পুজো হয়না । একটি মেয়েকে কেউ ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো ঐ মন্দিরের কাছে । নেকড়ে বাঘ নাকি তাকে পাহারা দিচ্ছিলো । পরে কোনো দরদী , মায়াবী মানুষ ওকে বুকে করে তুলে নিয়ে যায় । এইসব জেনে ও পড়ে ঐ দ্বীপে ঘুরে যান সের্গেই ।

ফেরার পথে উনি ঐ দেশেও যান যেখানে মেয়েদের কেনাবেচা চলে লুকিয়ে এবং একটি ভারতীয় মেয়েকে সেই হাটেবাজারে দেখে একটু অবাক হয়ে যান । কথামালা মেলে ধরতেই বুঝতে পারেন যে মেয়েটি লখিমগড় থেকে সমুদ্রে ভেসে এই তীরে পৌঁছেছে । জলদস্যুরা ওকে উদ্ধার করে মেরে না ফেলে বিক্রি করে দেয় । এক মূহুর্ত বিলম্ব না করে সের্গেই এই মেয়েকে অর্থাৎ সাধ্বী মহেশ্বরীকে কিনে নেন । সদ্য ভারত

ঘুরে আসা এই সাহেব প্রাচ্যের সভ্যতায় মজেছিলেন । ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি , সমাজ ব্যবস্থা , দর্শন ওকে মুগ্ধ করে ।

মেয়েটিকে কিনে ভেবেছিলেন উদ্ধার করলেন । কিন্তু মেয়েটির উজ্জ্বল চোখ ও ধ্যানের ব্যাপারটা শুনে বুঝতে পারেন যে এই মেয়ে কোনো সাধারণ নারী নয় এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই এই সাহেবের হাতে এসে পড়েছে । সাহেবের নিজের পৈত্রিক ফার্ম ও বিরাট বিজনেস ছিলো এগ্রিকালচার সংক্রান্ত । গম, বার্লি , ভুট্টার ক্ষেত । সোনারঙা গম ক্ষেতে আলো পড়ে চকচক করে । আর করে থাকেন আলু চাষ । দিগন্ত বিস্তৃত আলু ক্ষেত । এছাড়া হাঁস আর মূর্গী চাষ করেন । ডিম বিক্রি আর মাংস বিকিকিনিও চলে । এলাহি ব্যাপার । বছরে একবার ছুটি নিয়ে ঘুরে আসেন দূরে কোথাও । এইভাবেই প্রাচ্যে যাওয়া ।

জলদস্যুর কোপে পড়া এক জলজ্যান্ত ভারতীয় দেবী আজ ওঁর মুষ্টিবদ্ধ । কাজেই এই মেয়েকে যথেষ্ট সম্মান দিতেই হবে । এরকম মনে করে বিয়ের প্রস্তাব দেন মুগ্ধ সাহেব যার নাম : সের্গেই । আলু ডিম চাষী সবুজ মানুষ । বরফে যখন ঢেকে যায় চরাচর তখন ফায়ারপ্লেসে আগুনের তাপ নিতে নিতে মনে হয় একজন সাথী থাকলে মন্দ হয়না । এবং সে যেন বহুদিন সের্গেইকে সঙ্গ দিতে রাজি থাকে । নিত্যনতুন গার্লফ্রেন্ড ব্যাপারটা সের্গেই এর ঠিক মন:পূত হয়না । কিন্তু ওর দেশে ভার্জিন মেয়ে আর সারাটা জীবন একসাথে কাটাবার মতন সাথী, চট্ করে পাওয়া যায়না । সেদিক থেকে ও একটু পুরনো পন্থী । দলছুট্ বলাও যায় । তাই এটা যেন মেঘ না চাইতেই গমক্ষেতে ঝমঝম বরিষণ ।

আজব সিচুয়েশান । মেয়ে রাজি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে । সের্গেই এর মতলব ছিলো ,একটি মেয়েকে উদ্ধার করা আর সেটা করে কিছু পুণ্য অর্জন করা । ভারতীয় মেয়ে পেতে সোনায় সোহাগা হল কারণ সে যা খুঁজছিলো হয়ত এবার হবে । বাকি জীবন অন্তত: বৌয়ের খোঁজে ওকে আর পথে পথে ঘুরতে হবেনা । বরফ ঢাকা প্রাঙ্গনে গরম কফির পেয়ালা এগিয়ে দেবে , ওর সাথে অযথা বকবক করবে , জীবনের সব সুখ আর দু:খ ভাগ করে নেবে আর হতাশায় ভরসা দেবে । মাঝে মাঝে আলুর ভারতীয় ভাই কী প্রকারে উনুনে রূপ বদলায় সেটাও জানবে ।

ভারত প্রেমে দুই চোখ তখনও বুজে আছে । সেই মধুর আবেশ সহজে কাটাতে মোটেও ইচ্ছুক নয় সের্গেই । আর এরকম ইন্সট্যান্ট সাধ্বী ওর হাতের মুঠোয় - নাহ্ ! একে মিরাকেল ছাড়া কিছু বলা চলে না ।

কয়েকদিন সময় দিলো পুঁচকিকে সের্গেই সাহেব । তারপর হয়ে গেলো বিয়ে । পুঁচকির প্রিয় হয়ে উঠলো স্বামী সের্গেই ।

দুজনে যেন দুজনের সোলমেট । মেড ফর ইচ আদার ।

কাজেই মহেশ্বরীতে রূপান্তর, সের্গেই এর গ্রীন সিগন্যালের কারণেই সম্ভব হয়েছে । আর ওরা তো সবকিছু ফ্রিতে দেন । দীক্ষা , দুবেলা সুখাদ্য

তাও বিদেশে আর অঢেল শান্তি । মহেশ্বরীকে নিয়ে কোনো স্ক্যাম নেই । তার একটা বড় কারণ বোধহয় উনি নির্বাক গুরু । সের্গেই আর পুঁচকি কাউকে স্ক্যাম করেন না ।

সের্গেইকেও দেখলো ইরা । ভালোমানুষ মনে হয় তবে খুব বাস্তববাদীও । লজিকে চলেন -কেবল ইমোশান্স্ দিয়ে চলেন না ।

একটু যেন বেমানান পুঁচকির পাশে কারণ বয়স বেশ বেশি, মহেশ্বরীর চেয়ে ।

জুনিরা খবর পেয়ে খুব এক্সসাইটেড্ । নিজের চোখে হারানো পুঁচকিকে দেখতে চায় । ওকে লিখলো যে সের্গেই আর পুঁচকি কি একসাথে শোয় ? ওদের বিবাহিত জীবন কি অ্যাডাল্ট রিলেশানের মতন নাকি সাধুদের মতন ওরা এসব মানুষী ব্যাপার স্যাপার থেকে শত-হস্ত দূরে থাকে ।

ইরা বললো : দেখো বাবা জুন আমি অতশত জানিনা । ওদের পার্সোনাল ব্যাপার জেনে আমি কী করবো ? তবে মহেশ্বরী পুঁচকি হলেও জেনুইন আর নাহলেও । উনি ভন্ড সাধ্বী নন এই কলিযুগে সিংহভাগের মতন । কবীরের দোহা পড়নি ?

--কে বলেছে মোক্ষম্ এর জন্য অনেক অনেক জন্ম চাই ? ঈশ্বরকে নিজ স্বামীর মতন ভালোবাসো । মোক্ষম্ এইজন্মেই হয়ে যাবে ।

ইটার্নাল ব্লিস । মোক্ষম্ । আনন্দম্ আনন্দম্ । কোনো চিন্তা নেই । ইগো নেই কেবল শুদ্ধ চেতনা । আর অশেষ আনন্দের ঝর্ণাধারা ।

রবিঠাকুরের গান মনে নেই ?

আলোকেরই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও , আপনাকে ঐ লুকিয়ে রাখা ধূলায় ঢাকা --ধুইয়ে দাও ---

লুকিয়ে রাখা পিওর ব্লিস । তাকে ইটার্নাল লাইট দিয়ে ধুইয়ে দাও ।

ফ্যান্টাস্টিক । কবিগুরু কোনো অ্যাভারেজ রাইটার নন- হি ওয়াজ আ

ফিলোসফার অ্যান্ড গ্রেট থিঙ্কার । তাই তো মানুষ তাঁকে মহামানবের আসনে বসিয়েছে । আজ এতবছর পরেও লোকে তাঁর কীর্তিকে এত সম্মান দিচ্ছে ।

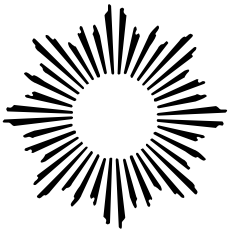

ইরার জীবনটা সত্যি আশ্চর্য এক কাহিনী । এক মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের জীবনে এত রহস্য আর রোমাঞ্চ একইসঙ্গে --সচরাচর দেখা যায় না ।

কারণ ইরা এবার যাকে মহেশ্বরীর আখড়ায় দেখলো তার জন্য সত্যি সে প্রস্তুত ছিলো না । এক চোরা ভালোলাগার স্রোত বয়ে গেলো অন্তরে । যেন হৃদয়ের এই সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গিয়েও যায়নি ।

এই পরবাসে, একদিন হঠাৎ রহস্যজনক পরিস্থিতিতে চাবিটা চলে এলো সোজা হাতে । আর খুলে গেলো গুপ্ত ঘরের সুপ্ত দরজা ।

শিরিষ সিন্‌হা তিন সন্তানকে নিয়ে মহেশ্বরীর আখড়ায়। শান্তির দরকার ওদের সবার । বোঠানকে দেখা গেলো না । শিরিষ যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে । পাকা , রূপালি চুলের রেখা । বাচ্চারাও অনেক চুপচাপ । ওরা কুকুরকে খুব ভালোবাসতো তাই একজন কুকুর রয়েছে সাথে । তার নাম মাইকেল । শিরিষ বলতো : কুকুরেরা প্রভুভক্ত ছাড়াও খুব ইনোসেন্ট । ওদের দেখলেই আমার ভালোলাগে । ঝট্ করে সব স্ট্রেস কমে যায় । খুব ভালো কম্পানি তো বটেই আবার খুব বড় হিলার ওরা ।

কাজেই মাইকেলের প্রেজেন্সে অবাক নাহলেও বোঠান ঊর্মিলার অনুপস্থিতি একটু চিন্তায় ফেললো ইরাকে । মাইকেল ঈষৎ পৃথুল । একটু থলথলে । ওদের সাথে নাকি টেবিল চেয়ারে বসে মানুষের মতন খাবার খায় । হয়ত মাইকেল কুচকাওয়াজ করে না নিয়মিত অথচ বড়লোকের বাড়ির বলে অতিভোজন হয়ে যায় ! তাই কোথাও গেলে ও যাবে স্কুটারে, সাইকেলে নয় । মাইকেল চড়েনা সাইকেল । ইরা চড়ে ।

মোটু মাইকেল ।

পরে তো ও কুহুকে বললো : ওর নামটা পাল্টে করে দে মাউন্টেন । আকৃতির সাথে ভালো মানাবে । হিমালয় , শিবালিক যা ইচ্ছে হয় দিয়ে দে।

বোঠান, শিরিষের সাথে বিদেশে যেতো না । বেড়াতে যেতো অবশ্যই তবে সেটা সপরিবারে । এটা ওদের পরিবারেই দেখেছে ইরা । লোক লস্কর , চাকর বাকর পর্যন্ত সাথে যায় । বিদেশ হোক্ বা স্বদেশ ।

কিন্তু এখানে বোঠান নেই । অথচ ওরা শান্তি সন্ধানেই এসেছে ।

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে । এখন অবশ্য এগুলি নিয়ে ও ভাবতে চায়না । শিরিষের সাথে দেখা নাহলে জানতেই পারতো না যে ওদের সম্পর্ক এখনও আগের মতনই আছে । কারণ ওর এত্তো ভালোলাগছে আর শিরিষ

ওর দিকে যেভাবে চেয়েছিলো তাতে ও বুঝতে পেরেছে যে ওরও বুকের ভেতরে বাজছে প্রেম ঢাক্ ।

ও শিরিষের নেশা ছিলো যেমন সেরকম শিরিষ ছিলো ওর অভ্যাস । কাজেই বুঝতে ভুল হবেনা ।

যথারীতি একদিন দেখা হল শিরিষের সঙ্গে আর সেও কম অবাক নয় । সে নাকি জানতো যে ইরার সাথে তার একদিন দেখা হবেই । ইরা যে অভিমান করে সরে গেছে সেটা বুঝতে পেরে শিরিষ চুপ করে ছিলো । জানতো সময়ের অপেক্ষায় থাকলে হয়ত একদিন আবার মধুর মিলন হবে । কষ্ট যে হতনা তা নয় । বুকের ভেতরে একটা চাপা কষ্ট ! মাঝে মাঝে মনে হতে যে আর ব্যবসার কাজে মনে দিতে পারবে না ।

কিন্তু বহুদিনের সাথী ঊর্মিলা আর তিন নির্দোষ সন্তানকে ছাড়তেও মন চাইতো না । বাচ্চারা তো কোনো দোষ করেনি , করেনি ঊর্মিলাও । সে সারাদিন বাড়িতে বসে ওর তিন সন্তানকে মানুষ করেছে । সংসারের হাল ধরে রেখেছে । তা নাহলে আজ শিরিষ এইভাবে নিজের ব্যবসাকে এত বড় করতে পারতো না । আর ঊর্মিলাকেও সে ভালোবাসে । নাহলে এতগুলো সন্তানের মা সে হতে পারতো না ।

আবার ইরাবতী ওর জীবনে এক স্নিগ্ধ বাতাস । তাজা ফুলের সুবাসের মতন । চন্দন ধূপের গন্ধের মতন । জীবনটাকে একটা নতুন সুখপাখির সন্ধান দেয় । যখন মানুষ ক্রমাগত হ্যাবিট্সের দাস হয়ে দিন কাটায় ,

একঘেয়েমির চূড়ান্ত হয় সব -তখন ফ্রেস হাওয়ায় ভরে ওঠে মনের দরবার । ইরা ওকে পুষ্পগন্ধে ভরিয়ে দেয় ।

মোমের আলোর মতন শুদ্ধ ও নরম তুলতুলে ওর উপস্থিতি । হয়ত শিরিষের ঘরে কাজে ঢুকলো তখন শিরিষ ওর গালে আলতো হাত বুলিয়ে দিলো । হাতে ইচ্ছে করেই একটু ছুঁয়ে দিলো । সেই প্রথম জীবনের ইনোসেন্ট ভালোবাসার কথা মনে পড়ে যায় ।

ইরা আপ্লুত- ইরার ভালোলাগে । সেই প্রেম যা শিরিষের কাছে মধ্যদিনের গান সেই একই প্রেম , ইরার বাঁচার রসদ। সে সত্যি শিরিষকে ভালোবাসে । ওর কোম্পানির জন্য কিংবা অর্থবান বলে নয় । কোনো মতলব নেই ইরার । একশো পার্সেন্ট শুভার্থী । তাই তো এই ভালোলাগা । এত আবেগ ।

বাড়িতে জানাজানি হবার পরে, শিরিষ তো ঊর্মিলার হাত ধরে বেডরুমের সোফায় বসে পড়ে ।

--আমাকে ক্ষমা করে দাও , একটু বেশিবার আমি ভালোবেসে ফেলেছি । বিবাহিত হিসেবে এইসব টেম্পটেশান আমার জয় করা উচিৎ ছিলো সেটা আমি জানি । কিন্তু আমি একটু পা হড়কে পড়ে গেছি । তুমি ক্ষমা না করলে আমি কোথায় যাবো ? কুহু , কলি আর কিন্নরের কী হবে ?

শিরিষ খুব সফট্ । কাজেই ঊর্মিলা যখন দেখলো যে মানুষটি এখনও তারই আছে আর বাচ্চাদের জন্যেও ভাবছে তখন ক্ষমা না করার আর

কোনো কারণ দেখলো না । নিজের অহং এর ওপরে না নিয়ে পরিস্থিতিকে সে লজিক দিয়ে বিচার করলো । এবং জয়ী হল ।

শিরিষ আর যোগাযোগ করেনি ইরার সঙ্গে । ইরাও করেনি সেটা আলাদা এপিসোড । শিরিষের যে বুকে একটা খালি খালি ভাবে আসেনি তা তো নয় । খুবই খালি লাগতো কারণ সারাটাদিন ওরা একইসঙ্গে থাকতো আর কখনো রাতেও । মন্দারমণি , পুরী অথবা মুকুটমণিপুর আর কাজে গেলে বিদেশেও একসাথে যেতো । তখন হোটেলে দুটি আলাদা ঘর অফিসিয়ালি ভাড়া করা হলেও প্রতিবার-- ব্যবহৃত হত একটাই ।

ইরার স্বভাবে একটা অদ্ভুত কোমলতা আছে । বিনয় আছে । তাই হয়ত কর্মীরা প্রায় সবাই ওকে খুবই প্যাম্পার করতো । কাছের মানুষ বলে মনে করতো । ভালোবাসতো । তাই অফিসে সবাই এই সম্পর্কের কথা জানলেও কেউ তাই নিয়ে ওকে খোটা দিতো না ।

বরং অনেকেই ভাবতো যে মেয়েটা একটা বোকা ও সরল মেয়ে । ওর যেন চট্ করে কোনো বিপদ না হয় এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের কারণে ।

মোদ্দা কথা হল ওর সহকর্মীরা ওর মঙ্গলই চাইতো । ওর সারল্যের জন্য । সেটা শিরিষ সিন্হার সাথে সারাজীবন কাটানো দিয়েই হোক্ বা নাহোক্ মূল ভাবনা ছিলো ইরার যেন ভালোহয় ।

সবাই প্রায় ওকে বলতো : ইরা তোর/ তোমার /ইরাদি আপনার সব ভালো হোক্ এই প্রার্থনা করি সবসময় । আমাদের সবার প্রেয়ার্স তোমার সাথে । জানিনা এই চক্রব্যূহ্য থেকে কী করে একা বার হবে স্যারকে নিয়ে তবে আশা রাখি ঈশ্বর তোমাকে ঠকাবেন না ।

তবুও ওদেরই কেউ জানিয়ে দেয় হয়ত ঊর্মিলা সিন্হাকে ।

বাচ্চারাও ইরা চলে যাবার পরে সবসময়ই ইরা পিসিকে খুঁজতো । বিশেষ করে কুহু । বড়মেয়ে কুহু । ওই সবথেকে বেশি ইরা পিসিকে ভালোবাসতো । আর ইরাকে ও : পিসি তুই -- বলে সম্বোধন করতো ।

নতুন কিছু কিনলেই --ইরাপিসি দেখ্ না, এই ড্রেসটা কেমন হয়েছে ।

---পিসি ,আজকে অফিস ফেরৎ আমাদের বাড়ি একটু আসবি ? একটা হোমওয়ার্ক করতে একটু হেল্প করবি আমাকে ?

--- ভাবছি নাচের ড্রেস তৈরি করার জন্য একটা সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ি কিনবো । একটু যাবি ? বেছে দিবি আমাকে ?

এখন ইরা নেই বলে কুহুর হৃদয়ে একটা খাঁ খাঁ ভাব ।
প্রায়ই বলে : বাবা ,ইরা পিসি কোথায় গেছে ? আর আসবে না ?
ঊর্মিলা কী উত্তর দেয় শিরিষ জানেনা । কারণ জানাজানির পরে কেউ বাড়িতে ইরাকে নিয়ে আলোচনা করেনা । সবার কথা হয়- কিন্তু ইরার সম্পর্কে কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেনা ।

শিরিষ শুধু ওকে একবার বলেছিলো : কুহু শোনো, পিসি মহারাষ্ট্রে চলে গেছে । ওর বাবা, মা, দিদিরা ওখানে পঞ্চগণিতে থাকেন তুমি তো জানো । পিসি এখানে একা একা ছিলো তো -তাই ওর বাড়ির লোক ওকে ওখানে চলে যেতে বলেছেন । আসবে হয়ত কখনো , তুমি কান্‌হাইয়ার কাছে প্রে করো । দেখবো পিসি এসে গেছে ।

তবে ভুলেও ঊর্মিলার সামনে এইসব কথা উচ্চারণ করেনা ।
তখন কুহু জানতে চাইলে, শিরিষ চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে গৃহযুদ্ধের ভয়ে ।

আবার এখন দেখা হল এতদিন পরে । হয়ত বা কুহুর প্রার্থনার ফল ।
কুহু খুবই উত্তেজিত ওকে দেখে । জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না !
--পিসি, তুই আমাকে না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলি ?
আমি আর একটাও সুন্দর ড্রেস পরতে পারিনি তারপর থেকে । কে বেছে দেবে ? মায়ের তো মর্ডান আউটফিট সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই । মা অসম্ভব ওল্ড ভ্যালুজের মানুষ ছিলো । জানি, নিজের ডেড মায়ের সম্পর্কে এরকম বলা অনুচিত কিন্তু সেটাই সত্যি ।

ডেড মা ! চমকে উঠলো ইরা ।

চমকের উত্তর এলো শিরিষের কাছ থেকে । হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা লেগে ভিজে যাওয়া আঁখিপল্লবের মতন শিরিষের ডালে ডালে জলবিন্দু ।

আলতো হয়ে ঝরে পড়ছে সারা দেহে , চেতনায় । চেতনায় বর্ষার আলোড়ন । এলোমেলো -শিরিষ গাছের পাতাগুলি । ঝরাপাতার কান্না ঘরের চারপাশে ।

--ঊর্মিলা আমাদের বাড়ির একজন নেপালি চাকরকে নিয়ে ড্রাইভার সহ গিয়েছিলো ডুয়ার্সে , ওর অসুস্থ মামাকে শেষ দেখা দেখতে । সত্তর ঊর্দ্ধ মামা এখনও জীবিত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কারসাজিতে কিন্তু
আমাদের ঊর্মিলা , আমার সন্তানদের মা ঊর্মি হারিয়ে গেলো চিরদিনের মতন । কালিয়াচকের ভয়াল রায়টে ।
ড্রাইভার , চাকর আর ওদের মা কেউই প্রাণ হাতে করে ফিরতে পারেনি । তারপর থেকে আমরা আশ্রয়হীন হয়ে বেঁচে আছি ।
ঘরবাড়ি থেকেও মানুষ আশ্রয়হীন হতে পারে- এখন বুঝতে পারছি ।
আমাদের আর কেউ নেই , আমরা শিকড় উপড়ে ফেলা গাছের মতন বেঁচে আছি ।

শিরিষ সত্যি ভীষণ দু:খী বলেই মনে হল ইরার ।
বাচ্চারা আবার মায়ের মৃত্যুর জন্য নতুন করে কাঁদলো ।
সবথেকে বেশি কাঁদলো কিন্নর । ওকে লোকে মামাজ্ বয় বলতো ।

শিরিষ পরে ইরাকে গোপনে জানালো যে ইরার চলে যাবার পরে তার জীবনে যে বিরাট শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো সেই জীবন যন্ত্রণা থেকে বার হতে অনেক সময় লেগেছিলো । এই বেদনা এমনই যে কারো সাথে ও ভাগ করতে পারবে না । একবার সত্যি সত্যি মনে হয়েছিলো যে ওর উচিৎ ছিলো ঊর্মিলাকে ডাইভোর্স করে ইরাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া ।

ঊর্মিলার সাথে ও ৫০ শতাংশ ভালো থাকে আর ইরা ওর সোলমেট বলেই ওর মনে হয় । সেই ভালোলাগার কোনো শেষ নেই ।

ইরা ওকে পরজন্মের স্বপ্ন দেখাতো । ধার্মিক হওয়াতে ,পড়েছিলো গরুড় পুরাণের প্রেতখন্ড , আর ভিয়েতনামী মঙ্ক মানে লামা -নোবেল পিস প্রাইজের নমিনেশান পাওয়া শান্তির দূত --Thích Nhất Hạnh এর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়াতে জানতো যে পাস্ট লাইফ বলে একটা ব্যাপার আছে । **কর্মা** ওখান থেকেই আসে । মোট জমানো কর্ম থেকে যতটা এই জীবনের ভোগ তাই নিয়ে জন্মায় জীবেরা । বাকিটা জমা থাকে । আর ফ্রি-উইলের জন্য নতুন কর্ম তৈরি হয় ।

যাঁরা জীবন মুক্তা (মোক্ষম্ হয়ে গেছে) তাদের কোনো নতুন কর্ম তৈরি হয়না কারণ তাঁদের কোন বাসনা থাকেনা । তাঁরা জীবজগতের মঙ্গলের জন্য আসেন । বাহিক্য ভাবে তাদেরকে অনেক কাজ করতে দেখা গেলেও তারা রেডিও এর মতন । গান , কথা , নাটক সবই আলোড়িত হয়ে থাকে রেডিও সেটে কিন্তু খুললে দেখা যাবে যে ভেতরে কেউ নেই । জীবনমুক্তা মানুষেরা এইভাবেই এই ব্যাপারগুলিকে ডেসক্রাইব করে থাকেন । তারা শুদ্ধ চেতনা । কোনো মন বা বাসনা নেই তাই নতুন কর্ম তৈরি হয়না ।

জীবনমুক্তারা সবকিছুই করতে পারেন । কেউ মোক্ষম্ এর পরে ঘর সংসার করে বাকি জীবন কাটান । কেউ সাধুর মতন ব্রহ্মচর্যে নিয়োজিত হন । কেউবা স্বামী বিবেকানন্দের মতন সমাজসেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন আবার কেউ চাকরি বাকরি করে সাধারণ জীবন কাটান । কিন্তু অন্দরে সেই রেডিও-র মতন । কোনো ডিজায়ার এর ফায়ার নেই । শুধুই শান্তি

আর আনন্দ। আবার একটি স্পিরিচুয়াল গল্প আছে যেখানে এক জীবনমুক্তা , এক দেহপসারিণীকে বিবাহ করেন ।

স্পিরিচুয়াল ক্লাসিক বলে বন্দিত, বিখ্যাত বইঃ **আই অ্যাম দ্যাটের** উত্তরদাতা , সাধক ও জীবনমুক্তা -শ্রী নিসর্গদত্ত মহারাজের গুরুভাই, লাজুক রণজিৎ মহারাজ, মোক্ষম্ এর পরেও বহু বহুবছর একটি বারে হিসেব রক্ষকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন ।

কেননা মোক্ষ মানে আকাশ থেকে কিছু পড়বে না । কোনো মিরাকেলও হবেনা । শুধু চেতনার পার্সপেক্টিভটা বদলে যাবে । যা হলিউড, তাদের মেট্রিক্স সিনেমায় দেখিয়েছে ।
বটম লাইন হল : ডেস্ট্রয় ইওর মাইন্ড । তখন একটি শক্তি তোমার মধ্যে আন্দোলিত হবে । সেটাই গডহুড-্ । সমস্ত রিলিজিয়ান সেই মাইন্ড ডেস্ট্রাকশনের পদ্ধতিই শেখা । বাকিটা নির্ভর করে ধর্মযাজকের ওপর । যেমন নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে ধ্বংস করা যায় আবার নিউক্লিয়ার এনার্জি দিয়ে অনেক ভালো কাজও হয় ।

শুধু পিওর কনশাসনেসে ডুবে থাকো সবসময় । সেটাই মোক্ষ, সেই স্টেটই ঈশ্বরত্ব । পরমানন্দ । বাকিটা -পথভ্রষ্ট পুরুতের চাল, কলা, মূলো যোগানোর জন্য আমদানি করা মানুষী রিচুয়ালস্ সমস্ত ।
বিজ্ঞানও পরম সত্যর সন্ধানে রয়েছে ।বেসিক তফাৎ হল ওরা জানেনা যে চেতনা সর্বব্যাপী আর সেটাই মহাবিশ্বের মূল কণা । যেদিন বার করতে পারবে সেদিন ওরা ধর্মের মর্ম বুঝবে ।

পুরো লজিক্যাল আর অঙ্কের ছক যাকে বলে । তাই গাঁজাখুড়ি না ভেবে ও বিশ্বাস করেছিলো কিন্তু পরজন্মে আবার ইরার সঙ্গে দেখা হবে নাকি আর ইরাকে চিনতে পারবে কিনা এই নিয়ে সংশয় ছিলো । তাই হেসে বলতো : যে যেখানে আছে থাক্ আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী । হব অপরাধী । লেট্স জাস্ট বি ফোকাসড্ ।
মেক লাভ , হ্যাভ ফান অ্যান্ড ফরগেট এভারিথং । কী রাজি ?

ইরাকে অনেকে মজা করে বলতো : তুই ওর কনসর্ট । কুইন না স্রেফ কনসর্ট । ইরা পাল্টা হেসে জবাব দিতো রুক্ষ স্বরে : আমি কনসর্টও নই মিস্ট্রেস্ ও নই । আমি ওর ড্রিম গার্ল । ওর জীবনে লেমনগ্রাসের সুগন্ধী পরশ । ব্যস্ । আগে দেখা হয়নি বলে কোনো একটা বিশেষ নাম দিয়ে দেওয়া আমাদের সম্পর্কের বা অন্য কারো গভীর সম্পর্কের ,আমি স্ট্রংলি অবজেক্ট করি ।ঋষি শ্বেতকেতুর মা- তাঁর বাবাকে ফেলে পালিয়ে ছিলেন বলে উনি বিবাহ প্রথা চালু করেন আমাদের সমাজে । তার আগে মেয়েরা নিজ ইচ্ছায় সঙ্গীকে ছেড়ে দিতে পারতো । আর পুরুষেরাও । আর নারীবাদ ফাদে আমার কোনো আস্থা নেই । আমি কাজ করে খাই । নারীটি কে তার ওপরে নির্ভর করে তার পরিস্থিতি । কর্ণম মালেশ্বরী অথবা ছাতির ওপরে হাতী তোলা- রেবা রক্ষিতকে আর কোন পুরুষ কী করতে পারবে ? ওঁদের এক আঙুলের চাপেই পুরুষ ফিনিশ ,শেষ ।

শিরিষ , ইরাকে হারানোর বেদনা থেকে ধীরে ধীরে বার হয়ে আসছিলো । যদিও এই যন্ত্রণা কোনদিনই পুরোপুরি নির্মূল হবার নয় সেটা বুঝতো ।

তবুও আস্তে আস্তে রিয়ল ওয়ার্ল্ডে , হার্শ লাইফে সে ন্যাভিগেট করছিলো । যেখানে সমাজের ভয়ে মানুষ নিজের সমস্ত স্বত:স্ফূর্ত প্রবৃত্তিকে চেপে রাখে । সবই হয়, তবে মনে মনে । সেই কবিগুরুর গানের মতন : কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা , মনে মনে ।
শিরিষও গানের সুরে ডানা মেলে দিয়ে ভেসে বেড়াতো মন গগনে । যেখানে কেউ ওকে জাজ করার নেই । নেই সাতপাঁকে ঘোরা সঙ্গিনী ঊর্মিলাকে ঠকাবার ব্যাপার কিংবা তার হৃদয় চুরমার করে দেবার ঘটনা । কারণ তার ভুবনটা আবর্তিত হয় কেবল শিরিষ গাছের ছায়াকে ঘিরে । আর আলগা ঘাসপাতার মতন ঘিরে আছে তিন সন্তান ও পরিবার পরিজন, চাকর বাকরেরা ।

গৃহবধূদের জীবনটাই সবচেয়ে কঠিন । ২৪/৭ কাজ তাও মাইনে ছাড়াই । আর সুযোগ পেলেই লোকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েনা । শিরিষের সংসারী , রসুইঘরে আবদ্ধ মা --না থাকলে আজ সে এতবড় হতে পারতো ? পারতো না । মায়ের আঁচলের স্নেহ আর শুভকামনাই ওকে শিরিষ করে তুলেছে ।

যেকোনো মানুষ বাঁচে ভালোবাসার জন্য , ভালোবাসা নিয়ে ও দিয়ে । আর সেটাই বেশির ভাগ পশুর থেকে মানুষকে আলাদা করে ।
ওরা বাঁচে নিজেদের ইন্সটিঙ্কট্ নিয়ে আর মানুষ, ভালোবাসা প্রদীপের তাপ নিয়ে । যখন ইরাকে হারানোর ক্ষত সবে মলমের স্পর্শ পেতে শুরু করেছে ঠিক তখনই এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় হারিয়েছে স্ত্রী ঊর্মিলাকে ।

কালিয়াচক একটা উপলক্ষ্য মাত্র । হয়ত বিধাতার এমনই ইচ্ছে ছিলো । হয়ত মনে মনে ঊর্মিলা খুবই ভেঙে পড়েছিলো । তার সমস্ত স্নেহকে

উপেক্ষা করে- নিজের বোনের মতন ইরা যখন তার পরম প্রেমাস্পদ স্বামীর ওপরে ভাগ বসাতে গেলো তখন বাইরে তেমন কিছু প্রতিক্রিয়া না দেখালেও মরমে মরে গিয়েছিলো ঊর্মি ; তাই হয়ত ভেতরে ভেতরে ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিলো ।

ওদের কান্‌হাইয়ার মন্দিরের বৈষ্ণব পুরোহিত, নরহরি দাস মশাই বলেন যে কখনো আজেবাজে চিন্তা করবে না । মানুষ যা চিন্তা করে তাই বাস্তবে পরিণত হয়, কোনো না কোনো সময়ে । কারণ আমরাই থট্ প্রোজেক্ট করে করে এই আর্থ প্লেন চালাই । সেই অর্থে সুপ্রিম বিং বা ভগবান বিষ্ণু কিংবা হরি যাই বলো উনি নির্গুণ । পিওর ব্লিস্ । শুধু আনন্দ । কাজেই আজেবাজে চিন্তা করলে মানে প্রোজেক্ট করলে- সেগুলি যে চিন্তা করছে তার কাছে এসেই শেষ হয় । তাই তো মহাপুরুষেরা বলে গেছেন যে সৎ ও শুদ্ধ চিন্তা করবে । বুদ্ধদেব বলেছেন : হোয়াট ইউ থিংক ,ইউ বিকাম ।

হয়ত ঊর্মিলার গোপন চিন্তা , মনোবাসনা ফিরে এসেছে তারই কাছে । আত্মহননের ইচ্ছা । একটু ফাস্ট স্পিডে, এই আর কি ।

কালিয়াচকের রায়টের কথা শুনেছিলো ইরাবতী । কিন্তু তাতে যে ওর কাছের কেউ এইভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তিন তিনটি সন্তানকে মাতৃহীন করে দিয়ে সেটা ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি । ওর আর শিরিষের সম্পর্কের কথা জানলে বোঠান তো রাগ করবেই । সেটাই নর্মাল । কিন্তু তা বলে ইরা

তো আর বোঠানের ক্ষতি চায়নি । ডাইভোর্সও করতে চাপ দেয়নি । ও পরজন্মের স্বপ্ন দেখেছিলো । কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে । সেটাই সবচেয়ে বড় স্টেরয়েড , জীবন যুদ্ধের ময়দানে জীবিত থাকার । ও তো অফিসে কাজ করার সময় বোঠানের চুল কালেক্ট করতো । লম্বা , কালো কুচকুচে , শাইনি চুল । রেখে দিতো জমিয়ে । সেই কাজ দেখে সহকর্মীরা বলতো যে ও শুধু শিরিষ সিন্‌হা নয় -- তার স্ত্রী ঊর্মিলার দিকেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে । **smitten by Urmilla Sinha ...**

ইরা একবার ভাবছিলো বোঠানের চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে যে সেই চুলের **ডি এন এ** দিয়ে আবার নতুনভাবে বোঠানকে গড়ে তোলা যায় কিনা । মনে মনে নানান স্বপ্ন দেখছিলো । বোঠান আবার জেগে উঠেছে। কুহু, কলি আর কিন্নর তাদের মাকে ফিরে পেয়ে এতই আনন্দিত যে সারা ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে । আর শিরিষ ? সেও নিশ্চয়ই খুব খুশি । ইরাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে । ইরার অন্যরূপ দেখলো এবার তাই । ইরা ছাড়তে জানে । প্রেম মানে ত্যাগ । প্রেমাস্পদের জন্য । এটা যে বাস্তবেও হয় সেটাই অনুভব করলো । ইরা ওর স্ত্রীকে অ্যাসিড বাল্‌ব মারেনি । কটূভাষণে ভূষিত করেনি । এই তো প্রকৃত ভালোবাসা ! কাজেই পরজন্মে ওকে বৌ হিসেবে পেতে আগ্রহী হবে বলে মনে হয় ।

একবার ওকে জিজ্ঞেস করে শিরিষ, এক অসর্তক মূহুর্তে : সামনের জন্মে যদি দেখা হয় আর বিয়েও হয় তখন বাচ্চার নাম কী দেবে ?

ইরা খুব হাসে । তারপর এক মুখ হাসি নিয়ে বলে ওঠে : যদি ততদিন পর্যন্ত বিবাহ প্রথা থাকে , লিভ টুগেদার শুরু না হয়ে যায় ব্যাপক ভাবে তাহলে ছেলে হলে নাম দেবো কোরক আর মেয়ে হলে কাঁকন ।
এই নাম দুটো আমার খুব ভালোলাগে । আর এই জন্মে তোমার বাচ্চাদের ক দিয়ে নাম সব । আর এই জন্মেই তো আমাদের প্রেম শুরু তাই তার একটু ছোঁয়া থেকে যাবে কিড্স দের নামের সঙ্গে । আনন্দ পরশ । আনন্দ লোভী আমাদের জীবনে । শিরিষ দুষ্টু হেসে বলে- তাহলে চিনবেই তাই না ? একেবারে পাক্কা । আমরা কি জাতিস্মর হবো নাকি ?

লখিমগড়ে অ্যাসবেসটস্ ফ্যাক্টরি বন্ধ হবার পরে অনেক নতুন ইনিশিয়েটিভ শুরু হয়েছে । প্রথমতঃ পথের দুধারে অনেক তেঁতুল গাছের সারি গজিয়ে উঠেছে । তেঁতুল খুব উপকারি গাছ । বিভিন্ন খাদ্যে মশলা হিসেবে , আচার , ওষুধ ,ধাতু পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা আর গাছের কাঠ কাজে লাগানো ছাড়াও আরো নানানভাবে এর ব্যবহার দেখা যায় । পথপাশে- শীতল ছায়ায় ক্লান্ত পথিকের হৃদয় জুড়িয়ে দেয় তেঁতুলের কচি ,সবুজ পাতায় ভরা দৃষ্টিনন্দন আভা ।
এই গাছ বেড়ে উঠলে আর ফলন হলে সেগুলি কেটে বিক্রি করা , তেঁতুলের বাগিচা গড়ে তোলা এইসব করে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । তেঁতুল এখানকার লোকাল গাছ । বহু আগে অন্য কোনো দেশ থেকে হয়ত কেউ এনেছিলো ।
তাই এই সুন্দর সহজ ব্যবস্থা ।

এছাড়া এখানে মেয়েদের বিয়ে নাহলে- তাদের অন্য রাজ্যে চালানের এক পন্থা বেরিয়েছে । সেটা হিউমান ট্র্যাফিকিং নয় । যেসব মেয়েরা এখানে বর পেতে অক্ষম বা অন্যভাবে বলা যায় যে যাদের- এই দ্বীপের পুরুষেরা মনে করে অযোগ্য , অসুন্দর -- তাদেরকে ,তাদের অনুমতি নিয়েই অন্য রাজ্যে পাঠানো হয় । যেমন কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি দেয় । সেখানে কোনো বৃদ্ধ সাহেব তাকে গ্রহণ করে । বিয়ে করে । সেখানে কোনো বয়সের হিসেবে কেউ করেনা । ভারতীয় স্ত্রীর সেবা , সততা বৃদ্ধের কাম্য আর মেয়েটি একটি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে অতি সহজেই । তার সন্তানেরা এই প্রথম সারির দেশে মানুষ হবে । আবার অনেক জোয়ান পাত্রও ,অনেক সময় প্রাচ্যের মেয়েদের বিয়ে করে । ওদের কাছে, আমাদের ফর্সা আর কালোতে বিশেষ তফাৎ নেই । আমরা নিজেদের মধ্যে কালো-ফর্সা নিয়ে খেয়োখেয়ি করলেও ওদের চোখে আমরা সবাই কালো ।

বিদেশের সব সাহেব, নগ্নিকাদের ভক্ত- কথাটা ঠিক নয় । ওরাও নগ্ন মেয়েদের ড্যাম চিপ্ বলে অভিহিত করে । ওদের দেশের নারীদের এত এক্সপোজে অনেকেই বেশ অসন্তুষ্ট । কাজেই ভারতীয় মেয়ে অনেকের কাছেই লোভনীয় । আর এইধরণের মেয়েরা ফট্ করে স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়না । অনেক কম্প্রোমাইজ করে । তাই একটু শ্যামলা রং আমাদের চোখে হলেও ওদের কাছে সেই মেয়েরাই স্বভাব গুণে মোহময়ী । তাই এই লখিমগড় দ্বীপের এই ব্যবসা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে । ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে অনেক রূপসী, বিদেশ যাবার লোভে লখিমগড়ের উপযুক্ত পাত্রদের উপেক্ষা করছে । দুটি সংস্থা গজিয়ে উঠেছে যারা- মেয়েদের

বিদেশে নিয়ে গিয়ে পাত্রস্থ করে তবেই ফেরে । মেয়েদের হিস্ট্রি চেক্ করার উপায়ও আছে। মনের শান্তির জন্য ।

এই সংস্থা দুটির মালিক -ললিতের স্ত্রী ডল বা ডলু । যে গাড়ির মডেল দেখে লোকের সাথে মেশে । বলেছিলো :: আরাধ্যা বচ্চন ট্যান্ট্রাম থ্রো করেছে ।

সেই ডলু এই দ্বীপে খুলেছে এই আজব এন জি ও । নাম মঙ্গলম্ ।

মঙ্গলম্ এর কল্যাণে আরো লোকের চাকরি হয়েছে । দ্বীপবাসীরা ডলুকে ধন্য ধন্য করছে । অনেক মানুষের সে আজ আশ্রয় । ছাদ । ওকে অনেকে ম্যাডাম না বলে মাদার বলা শুরু করেছে ।

যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়না তাদের দিশালি বলে লোকে চিহ্নিত করে ফেলতো । মূলস্রোতে তত গুরুত্ব পেতো না এরা । এখন এরাও সধবা-তা হোক্ না স্বামী কোনো ভিনদেশী । মানুষ তো বটেই । আর ওরা মিসেস ভিনদেশী । হ্যাঁ মিসেস, সবরকম ভাবেই । সাহেব অথবা যোগ্য অ্যাফ্রিকান/ জাপানী মানুষ এই দিশালিদের নতজানু হয়ে জিজ্ঞেস করছে : উইল ইউ ম্যারি মি ??

এও কি কম কথা ? বিদেশীরা, বৌ হিসেবে মানুষ খুঁজছে এখানে-- কোনো টফ্রি নয় । তাই জোছনাভেজা মানুষগুলি ডলুকে খুব সম্মান দিচ্ছে । হঠাৎ অ্যাসবেসটস্ কারখানাগুলি স্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে বহু লোকের

খাওয়া পরার সমস্যা দেখা দেয় । সেগুলি অনেকাংশেই কমে গেছে এখন । বিবাহপ্রথার নব-প্রথা জেগে ওঠায় ।
বিশেষ করে ডলুর অফিসে তেমন খাট্‌নির ব্যাপার নেই । মাইনেপত্র ভালো । মোবাইলের বিল দিয়ে দেয় কোম্পানি । আর তেঁতুল বাগিচাতে মাইনে ভালো হলেও অনেক খাটাখাট্‌নি যায় । তাই মানুষেরা এখানেই বেশি খুশি । চায় -ডলুর অফিস ফুলে ফেঁপে উঠুক ।

ডলুকে ওর স্বামী ললিত ক্ষ্যাপায় : ***তুমি তো সেলিব্রিটি হয়ে গেলে দেখি !***
হ্যাঁ , ডলুর সাক্ষাৎকার বার হয়েছে অনেক ওয়েবসাইটে । পেপারে । ওর হাই প্রোফাইল বন্ধুরা , ওর নাম -নানান পুরস্কারের জন্য প্রপোজ করছে । মানুষের জন্য কাজ করছে **এন জি ও মঙ্গলম্** । ডলের ব্রেন চাইল্ড ।

পোষা কুকুরের মতন একটা চিপ্ (প্রাইজের চিপ্) এই ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না গলায় লটকানো হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি নেই । কারণ নিজেদের যোগ্যতা আর ক্ষমতার ওপর এরা সন্দিহান । কাজেই অন্য কোনো সংস্থা, যতক্ষণ না সার্টিফাই করছে ততক্ষণ ঠিক মনটা ভরে না । যেন মানুষ মারা যাবার মতন । মরে ভূত হয়ে গেছি আমি কিন্তু চিকিৎসক আমার ডেড সার্টিফিকেট মঞ্জুর করেন নি বলে আমি এখনও জীবিত আছি আইনি মতে । অনেকটা সেইরকম ---ডলুর মানুষের জন্য কাজ । আর আন্তর্জালে বসে চালিয়াতি তো আছেই!

যাঁরা সত্যি মানুষের জন্য কাজ করেন, তাঁরা নীরবে করেন । গলা ফাটান না । কাজের মধুগন্ধ, একদিন হাতের মুঠোয় সমস্ত পুরস্কার নিয়ে আসে । তখন মানুষ বোর হয়ে যায় । প্রাইজ পেতে পেতে । সৎ মানুষেরা বলে থাকেন : আমাকে অনেক দিয়েছেন এবার নতুন প্রজন্মের নবকোরকদের

দিন । ওরাই তো নতুন দিনের তরতাজা মানুষ । ওরাই জ্বলন্ত মশাল নিয়ে- এগিয়ে দেবে দূর্বল মানুষকে , ভবসাগরের সোনালী সৈকতে ।

ইরার পরিচিত বাতাবীলেবুর গন্ধ অনেকদিন পরে আবার ভেসে এলো সকালের সোনা রোদের সঙ্গে । শিরিষের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে ঘুমিয়ে ছিলো । গুড মর্ণিং কিস অনেকদিন পরে পুরনো অভ্যাসের মতন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো । ফিরে এলো টি-রোজ পার্ফিউমের সুগন্ধ । ওটা শিরিষের ভালোলাগতো বলে এই একটিমাত্র সেন্ট ও ব্যবহার করতো । অবশ্যি মাঝে মাঝে চন্দন গন্ধ বা গোলাপের আতর লাগাতো । কেবল দেহে নয় , স্তন বৃন্তে নয় -সমস্ত কনশাসনেসে !

বাচ্চারা বাড়ির অন্যদিকে, অন্য ঘরে । বিদেশে মানে এই দেশে শিরিষের একটা বাড়ি আছে । সেখানেই ওরা উঠেছে । বাড়িটায় চাকর বাকরও আছে । আর আছে পৃথুল সারমেয় মাইকেল ।
শিরিষ ওকে সময় দিয়েছে । সাতপাঁকে বাঁধতে চায় ।

ইরা সময় নিয়েছে । নিজের জন্য নয় , জুনিরার সঙ্গে কথা বলার জন্য । কারণ বিয়ে হয়ে গেলে ওকে কলকাতা চলে যেতে হবে । জুনিরার এত বছরের দায়িত্বের কাজ ছেড়ে ।

শিরিষের সন্তানেরা, ইরাপিসিকে পেয়ে খুবই খুশি । মায়ের আসনে অন্য কাউকে বসাতে ওরা নারাজ হলেও ইরাপিসিকে সেই চেয়ারে দেখতে ওদের কোনো আপত্তি নেই । বরং ওরা এক্সাইটেড্ । মায়ের মতনই পিসি অথচ আরো মর্ডান আর ওদের কখনই বকেনা ।

কাজেই সোনায় সোহাগা ।

একদিন শিরিষ ওকে একটা চমক দেয় । ওর বাসার সামনে থেকে ওকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় । তখন ও বাড়ির পাশের দোকানে কিছু জিনিস কিনতে ব্যস্ত ছিলো । সাঁঝবাতির আলোতে তখন দুজনকেই দেখলো । ওর চোখ বন্ধ করে ছেলেগুলো ওকে নিয়ে গেলো এক বন্ধ ঘরে । চারিদিকে ঘুটঘুটে আঁধার । তারপর ওর চোখে খুলে দিলো ছেলেরা । ও অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে এমন সময় দলবেঁধে শিরিষ ও বাচ্চারা এগিয়ে এলো । ঘরের কোণায় জ্বলে উঠেছে বিরাট পুরনো একটি লন্ঠন । তাতে অল্প আলো আসছে ঘরে । কেমন মোহময় , জাদুকরী আলো । সত্যি যেন ওর প্রেম ;জাদুকরী । আঁধার ভালোলাগে কিন্তু তাতে সল্‌মা , চুমকির মতন তারা ওড়নাও মন্দ লাগেনা ।

আসলে এরকম একটি আঁধার ঘরে শুধু লন্ঠনের আলোতে ও শিরিষকে দেখতে চেয়েছিলো কোনো সে এক প্রাচীন অট্টালিকায় ।
এটা অট্টালিকা নাহলেও একটি অতি পুরাতন ফার্মহাউজ , নড়বড়ে সিঁড়ি কাঠের পাটাতন সমেত আর বড় বড় ঝাড়বাতি ।

সারা ঘরে একটা কেমন সুন্দর ফুলের গন্ধ । নাম না জানা ফুল ।
রোমান্টিক পরিবেশ । উদাস হয় মন , হৃদয়ে ভালোলাগার ডমরু বাজে ।

বাচ্চাদের নিয়ে গেলো চাকরেরা । কিডন্যাপ যারা করে আনে সেই যুবকেরা , সবাই ভাড়া করা লোকাল নাটকের অভিনেতা ।
এখন ঘরে শুধু শিরিষ আর ও । ইরার খুব ভালোলাগছে যে বহুকাল আগে বলা এই ইচ্ছের কথা এতবছর ধরে শিরিষ মনে রেখেছে আর সেটা বাস্তবে করে দেখিয়েছে ।
ততক্ষণে শিরিষ এসে গেছে কাছে । আলতো করে ওর হাতটা ধরে বললো : কফি খাবে ?
--ইস্ ! ইরা বলে উঠলো । এরকম একটা রোমান্টিক আলোতে ভরা ঘরে, সমস্ত মজা মাটি করে দিতে বোধহয় একমাত্র তুমিই পারো এই দুনিয়ায় । ডিসগাস্টিং !!

ইরার আরো দুটি ইচ্ছে ছিলো । চাঁদনী রাতে ভুট্টা পুড়িয়ে খাওয়া- মেঠো কোনো চুল্হায় আর ধানক্ষেতে যে মোটা নল দিয়ে জল দেওয়া হয় , গ্রামীণ এলাকায় , সেই নলের সামনে দাঁড়িয়ে শিরিষের সাথে স্নান করা । দুজনের উর্ধাঙ্গই অনাবৃত থাকবে । হয়ত ক্ষেতে তখন অনেক চাষী মেয়েরা ও পুরুষেরা কাজ করবে । কিন্তু মনে মনে তাদেরকে আবছা করে দিতে হবে ক্ষণিকের জন্য ।

শিরিষ ওদের কান্‌হাইয়ার মন্দিরে নরসিংহ অবতারের মূর্তি স্থাপন করেছে । তার জন্য বিশেষ পুরোহিত লাগে । সবাই এই কাজ করতে সক্ষম নন । যে কেউ করতে গেলে জীবনে নানান সমস্যা দেখা দেয় ।

নরসিংহ দেবের নানান রূপ আছে ।

কয়েকটি হল --উগ্র নরসিংহ , ক্রোধ নরসিংহ ,বীর , বিলম্ব , অঘোরা , লক্ষ্মী ,কোপ , যোগী , স্থানু , জ্বালা আর সুদর্শন নরসিংহ ।

এর মধ্যে লক্ষ্মী কিংবা যোগী নরসিংহ দেব সাধারণ মন্দিরে পূজিত হন । নিয়ম কানুন তত কঠোর নয় আর অন্যান্য রূপগুলির উপাসনা করতে হলে তার জন্য অনেক নিয়ম নিষ্ঠা মেনে চলতে হয় ।

তবে শিরিষের মনে হয় নিয়ম নিষ্ঠা বা প্রথা- বাহ্যিক না হয়ে মানসিক হওয়া উচিৎ । একজন পবিত্র মানুষের কোনো নিয়মের প্রয়োজন হওয়া উচিৎ নয় ঈশ্বরের আরাধনার জন্য । আবার দুরাত্মা যতই নিয়ম পালন করুক না কেন, প্রকৃত উপায়ে নরসিংহ দেবের কাছে নিজের আকুতি পৌঁছাতে অক্ষম হবে । কাজেই উইকেড মানুষের নিষ্ঠা নয়, মনের পরিচ্ছন্নতাটা বেশি দরকার । চাল মূলো কলা আর ব্রহ্মচর্যের থেকে । এগুলি উপাসনার লজিক্যাল সাইড । আর লজিকের দেবতা কে ? গ্রহ মার্কারি বা বুধ । কাজেই র‍্যাশন্যালি এগুলি ভেবে করা উচিৎ -- নিতান্তই তোতাবুলি না শুনে । নরসিংহ দেব -ভক্তের সারল্য , পবিত্র মন আর ভক্তিতেই খুশি হন । হাজার খানেক নিয়ম আর ব্রহ্মচর্যের ঢক্‌কানিনাদে না ভুলে । এটা শিরিষের মনের কথা । আর আজকাল যা যুগ পড়েছে তাতে সাধারণ মানুষ সবসময় ভয়ে থাকে , ইন্ডিয়াতে । কে কখন কোথায় বসে কী কলকাঠি নাড়ছে আর কীভাবে ফাঁসিয়ে দেবে

কোনো ক্রাইমে ---আজকাল তো সেলিব্রিটিদেরও জেল খাটতে হচ্ছে । কাজেই আম-আদমীর তো ভয় হবেই । ফলস্ কেসে কোথাও জড়িয়ে যাবার ।

শিরিষের মনে হয় যে সবার আন্তরিকভাবে ভগবান বিষ্ণুর অবতার , দা ডিভাইন অ্যাঙ্গার- নরসিংহ দেবের অর্চণা করা উচিৎ । ভক্তিভরে ।

একটি বিখ্যাত আশ্রমে নিত্যদিন ডাকাতি হত । গ্রাম আর জঙ্গল এর কাছে বলে । তখন ঐ আশ্রমে, নরসিংহ মূর্তি স্থাপণা করা হল বিশেষ নিয়মকানুন মেনে । তারপর থেকে ওখানে আর কোনোদিন ডাকাতি হয়নি । কাজেই মনের পবিত্রতা আর ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকলে, তিনি যত ফেরোশাস্ রূপ নিয়েই এখানে এসে থাকুন না কেন অথবা আমরা তাঁকে যতই হিংস্র রূপে কল্পনা করিনা কেন উনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করবেন । সমস্ত মন্ত্র, পুজো ইত্যাদির লক্ষ্য তো একটাই । তাহল চিত্তশুদ্ধি --- আআর পবিত্রতা ।

নরসিংহ দেব , তাঁর ভক্তদের সমস্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন । সুক্ষ্ম দর্শন হল : মাইন্ড থেকে প্রটেকশান দেন । অর্থাৎ মোক্ষম্ । নো মাইন্ড, অনলি পিওর কনশাসনেস্ । কিন্তু সাধারণ মানুষকে গ্রস ওয়ার্ল্ডেও রক্ষা করেন ।

মহামন্ত্র হল :

উগ্রম বীরম্ মহাবিষ্ণুম্ , জ্বলন্তম্ সর্বতো মুখম্-

নৃসিংহম্ ভীষণম্ ভদ্রম্ , মৃত্যু মৃত্যুম্ নমাম্ অহম্ ।

অন্ধ্রপ্রদেশের Ahobilam নামে একটি জায়গা নাকি সেই পুণ্যভূমি যেখানে ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য আবির্ভূত হন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু , নরসিংহ অবতার রূপে । এই জায়গায় নাকি হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ও সেই স্তম্ভ যা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ডিভাইন অ্যাঙ্গার লর্ড নৃসিংহ সেইসব রয়েছে ভগ্ন অবস্থায় । পুণ্যভূমি ও ট্যুরিস্ট স্পট এখন এই ঘন পাহাড় ও বনতল ।

এই জায়গা সত্যি সেই মল্লভূমি কিনা সেই নিয়ে বিতর্ক আছে কারণ এক ধর্মগ্রন্থে বলা আছে যে এই যুদ্ধ হয়েছিলো অ্যাস্ট্রালে । ধরিত্রীতে নয় । হয়ত সুক্ষ্ম শরীর কিংবা কারণ শরীরের কোনো দুনিয়াতে স্বয়ং নৃসিংহ বা নরসিংহ দেব নখ দিয়ে শতচ্ছিন্ন করে ফেলেন দানব হিরণ্যকশিপুর দেহ ।

ইরা বলে উঠলো : এই যুদ্ধ কেন অ্যাস্ট্রালে হতেই হবে ? এই দুনিয়ায় কী দানব নেই ? মডার্ণ এজের পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেকেই তো দৈত্য, দানব আর অসুরের মতনই ব্যবহার করেন । তারা লোভী , ঈর্ষাকাতর ও যুদ্ধপ্রেমী । ধবংস করতে উন্মুখ সবসময়- সবকিছু এতই ইগো তাদের । তারাই দুনিয়ায় আনরেস্ট ডেকে আনে । আলাদা করে দানব ধরতে অন্য কোনো জগতে যাবার দরকার আছে কি ?

এই যে --যে বা যারা, কালিয়াচকের দাঙ্গায় এত নিরীহ মানুষ ও বোঠানকে মেরেছে তারাই তো একজাতের অসুর । তাই না ?

শিরিষ এটা শুনে একটু ইমোশনাল হয়ে যায় । বলে ওঠে : জানো , আমি ঊর্মির শতছিন্ন বডিটা নিয়ে ছুট্টে গিয়েছিলাম হাসপাতালে । ওদের বলেছিলাম যে এটা জুড়ে দিয়ে দেখোতো ও জেগে ওঠে কিনা ! সেই

কাশিম ও আলিবাবার গল্পের মতন । কিন্তু ওরা কিছু করতে পারলো না ! তারপর মর্গ থেকে জুড়লো কোনোক্রমে । মর্গে এইরকম লোক থাকে যারা **মর্টিশান** (Mortician) নামে পরিচিত । এদের কাজই হল মৃতদেহ নিয়ে ফিক্স করা । দূর্ঘটনায় , ক্যান্সারে , আত্মহত্যায় বিকৃত দেহগুলি কে- কেটে ছেঁটে মোটামুটি সহ্য করার মতন করে ওরা সাজায় । ক্লায়েন্ট নানান আবদার করে । কেউ বধূর সাজে সাজাতে বলে কেউবা চায় নকল চোখ , দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে নর্মাল করতে । এক ব্যাক্তি মুখগহ্বরের ক্যান্সারে মারা যায় । তার চোয়াল ছিলো না । বাইরে থেকে দেখা যেতো মুখের ভেতরে জীভটা সর্বদা লিক্‌লিক করছে । মারা যাওয়াতে ওর প্রিয়জনেরা আবদার করলেন যেন গেস্টরা যারা সৎকারে আসবে তারা এই কদর্য রূপ দেখতে না পায় । তখন মর্টিশানকে ঐ মুখগহ্বরের গর্ত বা চোয়াল ভরে দিতে হয় রাবারের বলের মতন আকৃতি দিয়ে ।

একজনের এমনভাবে অপারেশান হয়েছিলো যে কিছু **তার** দেহের মধ্যে চেপে বসে গিয়েছিলো । যন্ত্র থেকে আলাদা করা মুস্কিল হয়ে যায় । তখন দেহ কেটে তাকে রূপ দিতে হয় এক মানুষের । অনেকে স্নো পাওডার মেক আপ করতে বলে দেন । সবই ঐ মর্গের কাশিমেরা করে থাকে । কিন্তু উর্মির, ধারালো অস্ত্রের কারণে শতছিন্ন দেহ ওরা জুড়তে পারেনি ----- কান্নায় ভেঙে পড়ে শিরিষ, হঠাৎ । এক অসহ্য বেদনায় ।

অনেকে ইরা আর শিরিষের মিলন হয়েছে শুনে বলেছে : ওরে শ্রীরাধিকা, তুই এবার নাম পাল্টে ইরা থেকে মীরা হয়ে যা । কৃষ্ণ ফিরে এসেছে তোর কাছে রুক্মিনী আর সত্যভামাকে ছেড়ে !

ইরা আবার হাসে । ও খুব হাসে । সহজেই হাসতে পারে । কুহু ওকে বলে : পিসি, তোর জন্য একটা চাকরী বাঁধা । কী বল তো ? জোকারের চাকরী ।

মাতৃহীন বাচ্চাগুলি যেন অনেকদিন পর এরকম প্রাণ খুলে হাসছে । ওরা মনে হয় সবাই খুব খুশি , ইরাকে পেয়ে । হয়ত আর মহেশ্বরীর কৃপালাভের দরকারই হবে না ওদের । ওরা- জ্যান্ত দ্বিতীয় মা ও সাথীকে পেয়ে গেছে । ইরা পিসি , ইরা পিসুন , ইরা পিপি । আর কী চাই ? অন্তত: এই মূহুর্তে ! শুধু পিসি ওদের বাবার স্ত্রী এটা একটু খাপছাড়া।

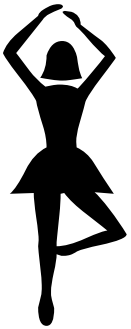

জুনিরাকে সব জানালো লখিমগড়ে ফিরে এসে । একদিন এক সুন্দর সন্ধ্যায় একসাথে বসে জুনিরা , হিমল্ আর ইরা । বললো যে শিরিষ ওকে বিয়ে করতে চেয়েছে । ওর স্ত্রী একটি রায়টে মারা গেছে । তিন সন্তান মাতৃহীন হয়ে গেছে । কাজেই ইরাকে ওদের বড় প্রয়োজন ।

ইরা ভেবেছিলো জুনিরা আপত্তি করবে কিন্তু নাহ্ ! ও সম্মতি দিলো । আর এও বললো যে ইরা যেন তাড়াতাড়ি চলে যায় ।

কয়েকদিন পরে শুনলো এক আজব গল্প । জুনিরার কাছেই । তখন ছিলো না হিমল সেখানে । এই দ্বীপের যেই মেয়েটিকে নেকড়েরা পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলো আর পরে এক বৈজ্ঞানিক আর তার স্ত্রী ওকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছে সেই মেয়ে আসলে নাকি জুনিরার মেয়ে ।

অনেকদিন আগে, জুনিরা তখন কাজ শিখতে গিয়েছিলো একটি অন্য রাজ্যে । সেখানে ওর আলাপ হয় এক কৃষ্ণবর্ণের তরুণের সঙ্গে । নাম তার ভাল্লাম্ । মেতে ওঠে দুজনে ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার খেলায় । বিয়ের আগেই একটি সন্তান জন্মায় । সেই মেয়ে হল কৃষ্ণা মেয়ে কামাক্ষী । যাকে নেকড়ে কূল পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে ।

মগজের পূর্ণতা নেই এটা বুঝতে পেরেই ফেলে দিয়েছিলো কামাক্ষীকে । শুধু কালোবরণের জন্য নয় । দিনের মধ্যে অসংখ্য বার মেয়েটি ফিট্ হয়ে যেতো । হাসপাতাল আর বাড়ি এই ছিলো জীবন তখন জুনিরা আর ভাল্লাম্ এর । তারপর ওর জন্মদাতা পিতা -সীসার মতন কালো মানুষ ভাল্লাম্ ; বাচ্চাটিকে কোনো অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবার কথা বলে ।

কারণ এই বাচ্চাকে মানুষ করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ।

জুনিরার, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিলো । কাজেই সেও সহমত হল । কিন্তু ফেলে দেবার জন্য প্রস্তুত হল । আশ্রমে না দিয়ে ।

এই লখিমগড়ের দ্বীপে, ওকে এনে একদিন অমাবস্যার রাতে ফেলে দেওয়া হল । ফেলে দিলো ওর বাবা আর মা । যাদের রক্তমাংস দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ওর কালো আর ফিটের ব্যামো সমৃদ্ধ দেহ ।

কিন্তু রাখে হরি তো মারে কে ? যাকে রাখো সাঁইয়া মার সাকে না কৈ, বাল না বাঁকা কর সাঁকে যো সব জগ বৈরী হৈ ।

মানুষের শত্রু, হিংস্র নেকড়ের দল ওকে পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলো ।

আর পরে একটি সুস্থ ঘরও পেয়ে গেলো । পেয়ে গেলো স্নেহ সিক্ত বাবা মা । যারা ওকে সেবা শুশ্রূষা করে বড় করে তুললো ।

বিদেশে চিকিৎসা করিয়ে প্রফেসর লুনি ওকে অনেকটাই সুস্থ করে তুললো । নিজেদের একমাত্র রূপসী মেয়ে তো অনেকদিন আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে । সেই শুন্যতা কোনোদিন পূর্ণ হবে আগে বোঝা যায়নি । কিন্তু কালো মেম -কামাক্ষী আসাতে সেই গহ্বর বহুলাংশে ভরে উঠলো । আদতে বাবা মায়ের স্নেহ, সন্তানের দিকে ধাবিত হয় কোনো কন্ডিশনের ওপরে ভিত্তি না করেই । সন্তান ঘৃণা করলেও বাবা মা তাকে আশীর্বাদ ও স্নেহ দেন । বর্ষিত হয় পুষ্পবৃষ্টি । মায়ের কোলজুড়ে বাচ্চাটি নির্ভয়ে বেড়ে ওঠে । পরম নিরাপদ আশ্রয়ে । তা হোক্ না কোলটি পাতানো মায়ের । মায়ের তো বটেই !

মেয়েটির আরো একটি গুণ দেখা দেয় । ও কিছুটা জড়বুদ্ধি হলেও কোনো সংখ্যা একবার দেখলে সে নিঁখুত উপায়ে চেনাতে পারে ।

যদি বিরাট একটি সংখ্যা দেখানো হয় যেমন : ২৯০৫৮৭৩২৯০-৩৬৫৮৯০০০+৬৭৩৫২৬৯০৮

কামাক্ষী, একবার দেখে নিয়েই সেই সংখ্যা কম্পিউটারের স্ক্রীনে কিংবা কোনো বোর্ডে -সংখ্যা স্পর্শ করে করে পুরোটা দেখাতে পারে ।

যেমন এই বৃহৎ আকারের যোগবিয়োগ সে টাচ্ স্ক্রিনের সাহায্যে করে দেখাতে পারে । নানান সংখ্যাগুলি আঙুল দিয়ে টিপে একদম শেষে ইকুয়াল টু সাইন চিপে এই অংকের উত্তর বলে দেয় ।

আপাতদৃষ্টিতে স্পেশাল চাইল্ড এই জড়বুদ্ধি মানুষী । কিন্তু অন্তরে অতীব প্রতিভাময়ী ।

ওর এই বিশেষ দক্ষতা দেখে, ওকে বিদেশে -অনেক ইনোভেটিভ উপায়ে ব্যবহার করে সেখানকার মানুষ । নানান প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ওকে করে তোলা হয় এক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর চতুর মেয়ে ।

ওর যেই অংশটি পজিটিভ -সেই অংশ নিয়ে সমাজের কাজে লাগানো হয় ।

একটি পেট্রল পাম্পে ও কাজ করে । ওর কাজ, সারাদিন বসে বসে পাহারা দেওয়া যে কোনো গাড়ি পেট্রল ভরে নিয়ে টাকা না দিয়ে পলালো কিনা । ও সেই গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখে মনে রেখে দেয় । গাড়িটি, পয়সা না দিয়ে পালালেই ওকে কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রশ্ন করা হয় গাড়ির নাম্বার প্লেটের সম্পর্কে । ও ততক্ষণাৎ নম্বর চিপে দেখিয়ে দেয় ।

যেমন ধরা যাক্ : VIT 34X5M 99Z

গাড়ি হয়ত পেমেন্ট না করেই পগার পার । কামাক্ষীর আঙুল তখন মনিটরে । ফেভিকলের আঁঠার মতন চেপে ধরে আছে এক একটি সংখ্যা আর অক্ষর , কালো মেম কামাক্ষী --একটু বেশি জোরের সাথেই ।

হয়ত অবচেতনে বোঝে যে ও কি করতে পারে , ওর দ্বারা কী সম্ভব !

শুধু ওর প্রকৃত বাবা ও মা এই সাফল্যের শিকিভাগও দাবি করেনা ।

এদিকে নিশ্চুপ মা , জুনিরা আর সহ্য করতে পারছে না !

পারলো না কেন -গার্বেজ দিয়ে শিল্প গড়া এক ভাস্কর, নিজ ভাঙাচোরা সন্তানকে গ্রহণ করে সাজিয়ে তুলতে নিপুন তুলিরেখায় ?

ফেলে দেওয়া বস্তু যার শিল্পের অঙ্গ সে কেন শিথিল মেয়েকে, শক্ত হাতে গড়ে তুলে এগিয়ে না দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলো মৃত্যু মুখে- একদল হিংস্র নেকড়ের সামনে --- কেন ? সার্থক হল কি তার শিল্পী জীবন ?

এতটা পথ ভাস্কর্যের প্রজ্জ্বলিত শিখায় চলা --- তাহলে কি সেও এক হিপোক্রিট ? ভেঙে ফেলা উচিৎ তার স্প্যাচুলা, চিজেল সমস্ত কিছু ।

রঙ বেরঙ এর সজ্জায় সজ্জিত তার স্টুডিও সত্যি হয়ত গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিৎ ।

কমান্ডো হিমল যেমন অন্তরে নারিকেলের মতন কোমল আর বাইরে শক্ত পোক্ত সেরকম বুঝি জুনিরাও বাইরে গার্বেজ শিল্পী কিন্তু হৃদয়ের কোণায়

তার বাস করে এক হিংস্র শ্বাপদ । যার উপস্থিতির কারণে তুলির আঁচড় পড়েনা নিজ অক্ষম, অসম্পূর্ণ সন্তানের চেতনায় । তার স্টুডিওতে মানুষ হয় গার্বেজ আর গার্বেজ হয়ে ওঠে এক একটি পণ্য ।

স্পেশাল চাইল্ড কামাক্ষী একজন স্পেশাল সোল-ও । প্রথমত: ওর জন্ম হয় পাক্কা ১৩ মাসের মাথায় । ওর মা এই প্রেগন্যান্সিতে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেছিলো । প্রতিবছর জন্মদিনে নাকি -আকাশে মেঘ দিয়ে সৃষ্ট যিসাসের ক্রস দেখা যায় ।

জুনিরা সব কথা হিমলকে বলেছে । হিমল ওকে একটু ধিক্কার যে দেয়নি তা নয় কিন্তু হিমলের সাথে মেয়েটির ওঠাবসা আছে বলে সে যে নিজ প্রেয়সীর সন্তান এটা জেনে কমান্ডো সাহেবের খুবই আনন্দ হচ্ছে । অসম্ভব গুণী এই স্পেশাল চাইল্ডকে কমান্ডোর খুব ভালোলাগে । এবার সে যে আসলে খুব কাছের একজনের রক্তমাংস এটা জানতে পেরে হিমলের খুশী আর ধরেনা ।

তবে জুনিরা ওকে অন্যগল্প বলেছে যা ইরাকে বলা গল্প থেকে অনেক আলাদা ।

ওর ইস্যু নাকি ওর বাবা ভাল্লাম্ এর পৈত্রিক দিক আর বংশ নিয়ে ।

মেনল্যান্ডের ছেলে ভাল্লাম্ আসলে এক দৈত্যকূলে জন্মায় । এই দানব বংশ বহু শতাব্দী ধরে মেনল্যান্ডে রয়েছে । এদের ক্ল্যানের নাম : দানু ।

ওদের পূর্বপুরুষ অসুর ভস্মরঞ্জন । সে এক পৌরানিক অসুর । তাকে হত্যা করে ভগবান শিবের কোনো এক অবতার । কিন্তু হত্যা করা সহজ ছিলো না । একবার পুড়ে গেলেই ওর ভস্ম থেকে কোটি কোটি অসুরের সৃষ্টি হচ্ছিলো । অস্ত্রাঘাতে এর মৃত্যু হবেনা এরকমই কোনো বর পেয়েছিলো।

সে যাইহোক ঐ অসুরকে ছলনার মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্র বশীভূত করে । তারপর শিব ঠাকুরের কোনো অবতার তাকে হত্যা করে ।

সেই কারণে এই দানব কূল পুজো করে রাহুকেতু , রাবণ , কংস এইসব চেতনাদের । ওরা বলে যে দেবতারা সবসময়ই উল্টো পথে দানবদের মেরেছে । ছলনা করে । সোজাপথে না পেরে । কাজেই ওরা দৈত্য পূজারি । আসুরিক ওদের প্রথা । পূজায় ওরা মদ দেয় প্রসাদ হিসেবে ।

মেঠো ইঁদুর রোস্ট করে খায় । প্রসাদ সেটাও ।

ওদের অসুর পুজোর সময় ওরা অশ্বারোহী হয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর মুন্ডু ছেদ করে থাকে । সেসব দেবতার অবয়ব কাপড় আর তুলো দিয়ে তৈরি করে ওরাই । শিবের মূর্তি পুড়িয়ে দেয় । কারণ ভস্মরঞ্জন শিবের জন্য নিহত হয় । ওরা অ্যান্টি গড্ । ঈশ্বর বিরোধী তবে নাস্তিক নয় । আস্তিক । দৈত্য পূজারী ।

হিমল্ হেসে বলে ওঠে : অ্যানাদার ওয়ে অফ লিভিং !!

ভস্মরঞ্জনের পুজোপাঠও হয় । ভোগ হল দেশী মদ, মেঠো ইঁদুরের রোস্ট আর প্রচুর সবুজ , টাট্কা মেথিশাক ।

মেথিশাকের বড়া ব্যসন দিয়ে তৈরি করে সেটা ডালের মধ্যে দিয়ে একটা কারি বানায় । খেতে মন্দ নয় । একটু অম্ল স্বাদের । তাতে অসম্ভব ঝাল কাঁচা লঙ্কা দেওয়া হয় । সেগুলি গ্রীষ্মে রোদে শুকিয়ে নেয় । কিছু ঝাল লঙ্কা বেটে নিয়ে দেবতাদের চোখে ছুঁড়ে মারা হয় । লঙ্কা গুঁড়ো ।

দেবতাদের বিচিত্র উপায়ে অপদস্থ করাই এই দানব কূলের একমাত্র কাজ । আর কলুর বলদের মতন খাটতে পারে এরা । খুবই পরিশ্রমী ।

ওদের ধর্মীয় সেইসব অনুষ্ঠানের সময় ওরা চন্দন বেটে কপালে নববধূর মতন লাগায় । তবে একটু ভিন্ন ভাবে । চোখের চারপাশে ডিজাইন করে

করে লাগায় । লাল আর সাদা চন্দন । আর শুধু লাইন ও ডট্ দিয়ে অঙ্কিত চিত্র যাকে রঙ্গোলি বলা যায় তাই দিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে রাখে ।

রঙিন এইসব আলপনা নাকি ওদের শিল্পকলা । হরিণের মুন্ডু কেটেও পুজো করে । আর মাংসটা খেয়ে নেয় । পান করে গরু ছাগলের টাট্কা রক্ত । পুজোর সময় ।

কামদেবতার পুজো হয় । অর্থাৎ ভোগের রাজ্যে যতরকম উপকরণ আছে সমস্ত ওরা ব্যবহার করে । দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যের কাছে নাকি ওদের এক পূর্বপুরুষ মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখেছিলো । সেই বিদ্যা ওদের পুরোহিত কূল বংশ পরম্পরায় বয়ে নিয়ে চলেছে । কারেন্ট পুরোহিত যমস্কন্দ সেই বিদ্যা জানেন । তবে উনি বহির জগতে আসেন না । একটি গুহায় অবস্থান করেন । ওর স্পর্শ পেতে হলে : নমামি যমস্কন্দ ঠট্ ফট্ গুহায়্ও ---এই মন্ত্র এক কোটি বার রোজ জপ করতে হয় যতক্ষণ না দেখা দিচ্ছেন । কাজেই বোঝাই যায় যে দেখা সম্ভবতঃ কেউই পায়না ।

নাহলে এত মানুষ ও পশু কি আর মারা যেতো ? যুদ্ধের দামামা বাজলো চারিদিকে , এত টেররিস্ট অ্যাটাক্ কিন্তু যমস্কন্দ ঠট্ ফট্ চলে এলে একবার --সবাই দিব্যি জীবিত হতে পারে । কিন্তু ঐ যে- ডেলি নিয়ম করে এক কোটি বার ঐ বিদ্ঘুটে মন্ত্রোচারণ প্রায় অসম্ভব এই সুপার ফাস্ট যুগে । কাজেই জেগে ওঠেনা মৃত কোনো সত্ত্বা । হাতের কাছে যমস্কন্দ থাকতেও ।

এদের সবকিছুই খুব দানবীয় । বাড়ির কেউ মারা গেলে ওরা সেই বংশের মেয়েদের একটা করে আঙুল কেটে দেয় । এইভাবে হাত ও পায়ের সব আঙুল কাটা পড়তে পারে ।

সন্তানসম্ভবা নারীদের জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় নয় মাস । তাতে নাকি প্রসব বেদনা সহ্য করার শক্তি তৈরি হয়ে যায় নিজের থেকে ।

শিশু জন্মালে কিংবা কারো বিয়ে ইত্যাদি হলে ওদের ঘাসের মালা পরানো হয় । সেই মালা বোনা হয় খোলা আকাশের নিচে ।

কোনো বাচ্চার নামকরণ করে দলের পান্ডা । বাবা ও মায়ের কোনো অধিকার নেই সন্তানকে আদরের কোনো নামে ডাকা । জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে । বিধবারা চুল বাঁধে না । আঁচড়ায় না । শেষে জটাধারী হয়ে দিন কাটাতে হয় । এগুলো ওরা সবাই মেনে চলে । বিয়ের আগে যেকোনো মেয়েকে তা সে যতই সুন্দরী বা কুশ্রী হোক্ না কেন , তার শ্বশুরের সাথে রাত্রিবাস করতে হয় । পাত্রের বাবা আগে যাচাই করে ও নানান গোপন প্রশ্ন করে দেখে নেবে মেয়েটি তার ছেলের সঙ্গে সহবাসের উপযুক্ত কিনা । তবেই বিয়ে হবে ।

ইদানিং অনেক পাত্রপাত্রী বিয়ে স্থির হলেই এলাকা থেকে চম্পট দেয় ।

আধুনিক জীবনযাত্রা না হলেও আস্তে আস্তে আসছে- একটু একটু করে রেনেসাঁ । আর সবচেয়ে ভয়াল বোধহয় মৃত্যুর পরের অংশ !

মৃতদেহ থেকে সমস্ত চর্বি কেটে নিয়ে বাড়ি লোকেরা ভোজ করে খায় । অর্থাৎ --তুমি এখন আর বেঁচে নেই কিন্তু আমাদের দেহের প্রতিটি কণা তবুও তোমার পার্থিব অংশ থেকে বঞ্চিত নেই । এই হল ফিলোসফি । এরকমভাবে যতদিন সম্ভব সেই চর্বি ও তেলের সদ্ব্যবহার চলে ।

ডেড বডি নিয়ে- একটি খাঁচা তৈরি করে তাতে বসিয়ে , উনুনের অত্যন্ত কম তাপে মূর্গী রোস্টের মতন ধীরে ধীরে অল্প আঁচে রোস্ট করে রাখা হয় । তারপর অরণ্যের ধারে রাখা ঐ মৃতদেহ, প্রকৃতি এক সময় গ্রাস করে ফেলে হয়ত বা কোনো বন্য পশু !!

ধোঁয়া দিয়ে সেদ্ধ করা এইসব মৃতদেহ, বনের ধারে ফেলে দেবার পরে আর কোনো দায়িত্ব থাকে না বংশের মানুষের । আর আগে তো তেলচর্বি ভক্ষণ হয়ে গেছে ।

এইসমস্ত শুনে জুনিরা ওরফে জুন আর সাহস পায়নি, নিজ সন্তানকে সভ্য সমাজে নিয়ে আসার । তাই তখন ফেলে দেয় । আজ মেয়েটি খানিকটা নিউরোলজিক্যাল ভাবে চ্যালেঞ্জড্ হলেও নিজ কৃতিত্বের জোরে পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে । মিনি সেলিব্রিটি । কাজেই জুনিরার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠেছে ।

হিমল আর কী বলবে ? ও তো দুদিকেই অধিষ্ঠিত কাজেই জুনিরাকেই পুরো দায়িত্ব দিয়েছে যা মনে হয় তাই করার ।

জুনিরা কেস করে দেয় । আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটিয়ে বিচারক মহাশয় বিধান দেন যে কামাক্ষী আর শুধু ওর বাবা , মা অথবা জন্মদাত্রীর সম্পত্তি নয় ও জাতীয় সম্পদ । একজন স্পেশাল চাইল্ডের এইরকম অভিনব ক্ষমতা দেশকে গর্বিত করেছে । ও মিনি হিউম্যান কম্পিউটার । কাজেই জাতীয় সম্পত্তি বলে দেশের মানুষ স্থির করবেন যে ওকে কে বাকি জীবনের জন্য কাছে পাবেন ---পালিত বাবা ও মা নাকি জন্মদাত্রী !

ঠিক হল অনলাইন ভোটিং হবে তবে কেউ ইচ্ছে করলে একটি বিশেষ সরকারী দপ্তরের ঠিকানায় ডাকেও চিঠি মানে ভোট দিতে পারেন ।

কোটি কোটি ভোট এলো , হ্যাঁ কোটি কোটি । অবিশ্বাস্য !

দেখা গেলো মাত্র ৬ জন ব্যাতীত সবাই চান যে কামাক্ষী ওর পালিত বাবা মায়ের সাথেই বাকি জীবন কাটাক । কারণ জন্মদাত্রী নিজ রক্তমাংস দিলেও শিশুটির সবচেয়ে দুর্বল মূহুর্তে তাকে ফেলে দিয়েছে নেকড়ের ডেরায় । যদিও ওর জন্মদাতা চেয়েছিলেন ওকে কোনো অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে কিন্তু জন্মদাত্রীর রোষ আর দোষের কারণে সেটা করতে পারেন নি । তবে তিনি নিজে তো এই কোর্ট কেস করেন নি- কাজেই তার কথা বাদ দেওয়া হোক্ ।

শেষপর্যন্ত মেয়েটি বেঁচে-বর্ত্তে আছে , ভালো আছে- জেনেই ওর বাবা ঐ রাক্ষসকূলের যুবক সুখী ছিলেন ।

কাজেই জাজ শেষপর্যন্ত বাচ্চাটির দায়িত্ব দিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী প্রফেসর লুনি ও তার স্ত্রী শ্রীকলাকেই । তারাই ওকে বড় করেছেন কাজেই তারাই ওর প্রকৃত রক্ষক , ভক্ষক নন ।

আর জন্মদাত্রী মা হয়ত দেহের অংশ দিয়েছে কিন্তু অতি হিংস্র আর সুবিধেবাদী মহিলা । কাজেই ভবিষ্যতে কামাক্ষীর ক্ষতি হবেনা নিজের মায়ের আঁচলে থেকেও সেই ব্যাপারে যেহেতু বিচারক মন্ডলী সিওর নন তাই অন্য ব্যবস্থাটাই বহাল রইলো ।

মায়াবী মানুষ বটে প্রফেসর লুনি ! কোর্টের বিচারকে অবজ্ঞা করে কামাক্ষীকে তুলে দিয়ে আসেন তার আপন মা জুনিরার কোলে ।

বলা হয় : তুমি এখন ওর জন্য ভাবছো সেটাই বিরাট ব্যাপার । অনুশোচনা করছো । আমরা জানি ও ভালো থাকবে । আর আমাদের দুজনের বয়স তো হল অনেক কাজেই তুমিই ওকে বেটার পজিশনে তুলে দিতে সক্ষম হবে । ভুল, মানুষমাত্রই হয় । কিন্তু সেই ভুলের মাশুল দেবার সুযোগ দেওয়া উচিৎ সবাইকেই । নেচারও দিয়ে থাকে । কাজেই কামাক্ষী তোমার ছিলো , আছে আর থাকবেও । শুধু কিছুদিন তুমি শীত ঘুমে গিয়েছিলে তাই এই দম্পতি ওকে আগুনের তাপ আর শীতল বাতাসের স্পর্শ দিয়েছে । এটাই সত্য । আর আমরা যতদিন জীবিত আছি ওর সাথে যোগাযোগ তো থাকবেই । আমরা লখিমগড় ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না । কাজেই---

চোখে জল এসে গিয়েছিলো জুনিরার , এক্স কমান্ডো- হিমলের শক্ত বাহু, ঋজু দেহের ভাঁজে মুখ লুকিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে । এই কান্না শুধু ইমোশান্স্ নয় , আত্মগ্লানির তরল প্রবাহও বটে ।

কামাক্ষীর আসল বাবাও ওর সঙ্গে দেখা করে গেছে । দানব প্রদেশ থেকে এসে । ভাঙা কূলো আজ দেশের ও দশের গর্ব । অনেক মানুষের ভরসা, নতুন আলো । বিদেশ থেকে এসে ওকে পুরস্কার দিয়ে গেছে বিদেশী মানুষ । আর কী চাই ?

ওদিকে নববধূর সাজে সজ্জিতা ইরাবতীর- মনে পড়ে এক নামীদামী মানুষের তির্যক মন্তব্য এইসব স্পেশাল চাইল্ড সম্পর্কে ::: এদের দেখলে আমার করুণা হবে কিন্তু সারাজীবন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এইসব মানুষগুলিকে আমি কখনও রেস্পেক্ট করতে পারবো না ।

ইরা মিসচিফ্ হেসে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলো এইসব সমাজপতির দিকে : হাউ অ্যাবাউট স্টিফেন হকিং ?

অন্যদিকের সংবেদনশীল মুখোশধারী মানুষ হয়ত কিছুটা লজ্জিত হয়েই উত্তর দেননি আর । কেবল বলেন:: হি ইজ আ গড ড্যাম গুড থিঙ্কার ।

আজ দুনিয়ার কোনো না কোনো কোণে বসে- হয়ত সংবেদনশীলতার নতুন পুরস্কার নিতে নিতে , গালভরা বুলি কপ্চাতে কপ্চাতে উনি জানতে পারছেন এই অভিনব কাহিনী ।

ইরার পরিচিত সেই ট্রাক-ড্রাইভারের ছেলে যে ডিসেবেল মানুষের জন্য কাজ করে থাকে, স্রেফ মানবতার খাতিরে- সে শুনে বলেছিলো :::

আজকাল এক একটা পুরস্কার প্রাপককে দেখে শ্রদ্ধা হয়না । মনে হয় রাস্তায় বার করে চপটাঘাত করি । এই সো-কলড্ সংবেদনশীল সেলিব্রিটিরও একই অবস্থা । বরং যারা প্রাইজ টাইজ পায়না তাদের দেখলেই বেশি রেস্পেক্ট হয় । কিন্তু উপায় কী ?

এদের বিরুদ্ধাচারণ করলে, সাপোর্ট করার জন্য নিজেরাই লোক খাড়া করে এগিয়ে দেবে । আরো এক লাখ মানুষ এদের হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে - বকলমে চাম্চা যারা । কাজেই সময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক ।

ইরা আর নতুন করে সেলিব্রিটি ভার্সেস আম-আদমীর যুদ্ধে যোগ দেয়নি । আরেক ন্যাকা চৈতন্য হয়ত আবার বলে বসবে : দুদ্ধ কেনো ? আবাল দুদ্ধ ? **ভ্যাঁ** !!

এতসব গভীর স্মৃতির আড়ালে ভেসে আসে নববিবাহের সুর ।

মাচুপিক্‌চুতে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে আসা ইরাকে, পাঁজাকোলে করে তুলে ঘরে নিয়ে যায় শিরিষ , নিজ কোটরে । বলে ওঠে : এখন তুমি কেবলই আমার , শুধু আমার ।

ইরা কপট রাগ দেখায় --এই ! আমি কোনো পুরুষের ট্রফি নই---!

রাগটা ঠিক শিরিষকে দেখায় না -মাচুপিক্‌চুর ভগ্ন স্তূপ , পাহাড় আর রহস্যময় চেতনাদের , যাঁরা ছায়ামানুষ হয়ে ওদের প্রেমের পূর্ণতায়

খিলখিলিয়ে হাসছে । নয়নতারায় ঝিলমিল ঝরিয়ে ।

সব জেনে শুনে , অসম্ভব বুড়িয়ে যাওয়া শাক-ঠাম্মা, তুয়া লোলাচয় বলে ওঠে : এই এত্তো ফুটফুটে একটা মেয়েকে ওর মা ফেলে দিয়েছিলো ? আমার একটাও মেয়ে নেই । থাকলে আমি কত্তো খুশি হতাম । আর এমন সুন্দর একজনকে পেয়ে ওর মা ! সত্যি এটা অবাক করার মতই ব্যাপার । মেয়েটা কী ভালো আর সরল !

এটাই হয়ত প্রমাণ করে যে :: ওয়ার্ল্ড ইজ আ নোশান ।

ছদ্মবেশী ছন্দোবদ্ধ

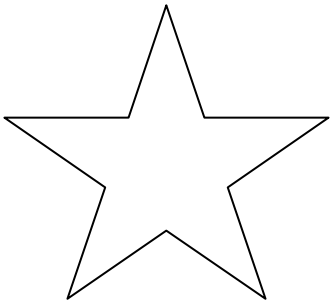

বিষণ

রাজহংসীর ক্ষতবিক্ষত ডানায় ভোরের শিশির

আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বৃশ্চিকের লালা

মিলেমিশে একাকার ।

নক্ষত্রহীন রাতবিষে আমি নরম গোলাপী ঠোঁট ভিজিয়ে নিই ।

শ্বেত কপোতেরা পথভুলে উড়ে যায় গন্ধর্বপুরে ,

বিষ ঢেলে দিই গতিপথে .....

'অক্ষমা' -আধুনিক জীবনের মহার্ঘ অলঙ্কার ।

তবুও সংহার

তালপাতায় ঢাকা মুখ-
অর্যমা নেতিয়ে পড়েছে

মন্দাক্রান্তায় কবিতা
লেখে না পূর্ণেন্দু .....

পৃথুল ছায়া গ্রাস
করেছে ।

শালভঞ্জিকারা রসকলি
কেটে হলকর্ষণ করে ।

শুকতারা আবীর ঢালে
তাদের আঁচলে ।

যূথবদ্ধ বেণী বেয়ে

মধু পড়ে বিলম্বিত
লয়ে -মৌতাতে মাতে
জলপরীরা.....তবুও_পচা

গলা দেহাংশ ভর্তি--
সোনালি মর্গের
দরজাগুলো খুলে যায়
পর পর ---এক দুই -
আড়াই ।

-

যুগান্তে

সোনালী বালি , ছোট ছোট মাছ

পরিযায়ী পাখি , লাল কাঁকড়া

ডুংরী নদীতীরে ।

মোহনার দিকে মুখ করে

বসে ছিলাম মেটে আসমানি পাথরে-

ঢেউ গুলো একে একে এসে

ভেঙে যাচ্ছিল পায়ের পাতার ওপরে ।

সমুদ্রের গর্জন , ফেনিল জল

চিকন বদ্বীপে , সিগালের ঝাঁক

ডিঙি নৌকায় ভাসছে নীলাব্জ

আমার কলেজ জীবনের হারানো প্রেম ।

মনে পড়ে শাল বালিতে লুটোপুটি ,

সবুজ ঘাসের আদর ।

এক মধুবর্ষী রাতে

পরস্পরকে প্রথম ছুঁয়ে দেখা

লাইব্রেরীর করিডরে ।

মাঝখানে ছিল ২১-টা বছর

দিন আসে দিন যায়

ক্ষয়াটে চাঁদ মেঘে লুকায়

এক শীত সকালে আবার দেখা

মাথায় বরফ কুচি ,কপালে বলিরেখা ।

তবুও যুগান্তে জোয়ার আসে

তটরেখা ভাসে

নি:সঙ্গ বালুচর আর অসংখ্য

লাল কাঁকড়াদের

ঢেকে দেয় সমুদ্রনীল ঢেউ.....

ঢেউ স্রোতে ভাসে, আমার একদা হারানো

সুডোকু- নীলাব্জ ----!

আমেরিকায় সর্ব সুখ , আমার বিশ্বাস

ছুটছে ঘোড়া ভাসছে তরী

উড়ছে এরোপ্লেন

আসছে মানুষ দলে দলে

আমেরিকার চরণতলে

সোনারূপো সবই ঝরে

আকাশ বাতাস ভূমিতলে

গোরা সাহেব কৃষ্ণাঙ্গী মেম

অন্য কোন তুতেনখামেন

সবাই বসেন এক আসনে

রাত হয়ে যায় দিন এখানে

আলোর মালায় ঢাকা ।

ফূর্তি শেষে ঘরে ফেরা

বুকে পাঁজর বিদ্ধ করা

যন্ত্রণাটি সত্যি শুধু সুখটি মনগড়া ।

শূণ্যতা যে হয়না ভরাট

নেই উৎসব নেই সে মেজাজ

হেমন্তের এক বিষন্নতায়

ফাগুন উপচে পড়া ।

কোথা ভবতারা ? দূর্গতিহরা ?

অশান্তি যে নাড়ে কড়া - আমেরিকায় ঢোকার যে পথ বাঁধানো দিয়ে সোনা; পালাবার পথটুকু শুধু নেই তো কারো জানা ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্রামপেট , এটাই এখন মোদের ফেট ।

দিবারাত্রির কাব্য

সূর্যটা হেলে গেছে গুলমোহর গাছটার
ওদিকে

ঘরে ফিরছে ক্লান্ত বিহঙ্গ

সেই মেয়েটা একলা দাঁড়িয়ে আছে

জারুল গাছের তলায়

শেষ বাসের আপেক্ষায় ।

রোজ রোজ যাওয়া আসা দিনলিপি মেনে

মানুষের ভীড়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়া

সময়ের তালে তালে ।

এলোমেলো চুলগুলো , কপালের টিপটা
মুছে গেছে

বাড়ীতে বুড়ো বাবা - অন্ধভাই

সামনের সপ্তাহে চোখের অপারেশন
আছে ।

টাকা চাই লাখ খানেক

কে দেবে ?

সমীরণ সাহা সুদের কারবারী

ব্যাঙ্কের থেকে কম ইন্টারেস্টে টাকা ধার
দেয় ।

বদলে একটু সোনালী সঙ্গ চায় ।

একটু প্রেম প্রেম খেলা , একটু ছোঁয়া

হাতে টাকা এসে যাবে ।

কথামতন গেল মেয়ে সাহা নিকেতন

একাই থাকেন উনি, স্ত্রী নেই ।

আজকের বিকেল বড় দ্রুত কেটে যায়

বিসমিল্লা খাঁ বাজছে সামনে **Vat 69-**

ফিনফিনে ধুতিতে সাহাবাবু বেমানান ।

ঘরে ঢুকতেই সানাই হল বন্ধ

চাকর --গন্দী গন্দী গন্ধী বাত্

চালিয়ে দিয়ে গেল ।

নীলগ্রহে , সুনীল সাগরের সব ঢেউ স্তব্ধ হয়

মহল থেকে সেই মেয়ে বেরোয় ,

হাতে এক তাড়া নোট ।

চ্যাংদোলা করে ভাসিয়ে দিয়েছে

নারীর সহজাত লজ্জা , অনটনের পারাবারে ।

চোখটা ভালো হলে, ভাইটা দেখতে পাবে

ফুল , পাতা , রামধনু ।

লজ্জা কে ? কোথায় তার বাস ?

এক শৌখিনতার নাম লজ্জা

গরীবের -নাগপাশ ।

নতুন আলোর হদিস

আমি আকাশ খাবো বাতাস খাবো

আগুন খাবো শীতল খাবো

মরু খাবো তুন্দ্রা খাবো

সবুজ খাবো ধূসর খাবো

আলো খাবো আঁধার খাবো ।

মন আমার ,

অমন কথায় দিস্‌নে কান ।

তার চেয়ে আয়

নীলাঞ্জন ছায়ায় বসে

কাঁসার বাটিতে নারকেল মুড়ি খাই .....

মধুর আলস্যে তুই তো পারিস

জোসনা কেটে ভেসে যেতে

মেঘের ওপার ।

খাই খাই ছেড়ে

মৃদু বাতাসে , একটু বোস

মেঘদূতের পাতা ওল্টানো যাক -

শরীরে মেখে যা আলস্যের মন্থর গন্ধ

সপ্তর্ষি মন্ডলের দিকে চোখ মেলে দেখ -

পেলেও পেতে পারিস আলো -ঝর্ণার
হদিস ।।

চিতা ভস্ম হাতে নিয়ে

ঐ যে প্রিজমটার

বিচ্ছুরিত স্পেকট্রাম দেখছো ,

তার সাতটা রঙ ধার করে

রাঙিয়েছি , নিজেকে ।

বঁড়শিতে গেঁথেছি অজস্র
মণিমুক্তো , পান্নাচুনী ।

আদরে আদরে নষ্ট করেছি
চাঁদকে ।

চিড়িয়াখানায় বারুদ পুঁতে এসেছি
নিরীহ পশুগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে
দিতে ।

চোয়াল তুবড়ানো বুড়িটার

নকল দাঁত খুলে লাগিয়ে দিয়েছি

সায়নাইড ক্যাপসুল ।

অথচ আমি মরে গেলেই

তোমরা দলে দলে এসে বলবে

আমি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলাম ।

মাউথ অর্গানে বাজাবে সেই
প্রাচীন সুর ,

যার অন্তরা জুড়ে আছে শুধু

আকন্ঠ বিষপান করে

আমার-নীলকন্ঠ হয়ে ওঠা ।

আমি মৃত্যু দেখেছি

আমি মৃত্যু দেখেছি । শববাহী একটি যানে

গাঢ় হাসপাতালের সবুজে মোড়া ।

জীবনের স্তব্ধ প্রবাহ বেয়ে

নেমে আসা হিমাঙ্কে- চিন্তাহীন করোটি,

তাজা ফুলমালা জড়ানো ।

দুধ সাদা পালক বিছানায় ,

শ্বেতপদ্মের চাদরে ঢেকে দিল

লাল টকটকে রক্তহীন একজোড়া পা ।

ঝলমলে হ্যালোজেন আলোর নীচে

লাল পা গোলাপী দেখায় ,

মুখখানিতে শান্তির ছোঁয়া ।

জানিনা মহামানব নাকি মহাপাতকী!

নিথর খোলসের চোখ জুড়ানো রূপ দেখে

কয়েক যোজন দূরে দাঁড়িয়ে , আমি

নিজ অন্তরের অন্তরে

নিজেকেই খুঁজে খুঁজে ফিরি ।

পেঁয়াজের খোসার মতন

এক এক করে খসে পড়ে

সব কটি ছাল--

নিজেকে খুঁজতে গিয়ে এক মহাশূণ্যতায়

দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যাই ।।

সংরাগ

রোদ ঝরেছে, ওম বিছিয়ে বসন্ত বনের ধারে
বসেছি আমি পা ছড়িয়ে অলস দিঘীর পাড়ে ।

পাখিরা সবাই লোম ফুলিয়ে গাইছে জীবনমুখী

একলা আমি , সবুজ বনে- তেপান্তরেই সুখী ।

ফুটলো পলাশ ফুটলো শিমূল লাল গন্ধ ভাসে

ঘোমটা টানা কালো মেয়ে চলেছে কাঠের আশে ।

দামাল ছেলে বাজায় বেণু ছড়ায় মনে পরাগ রেণু

কুঞ্জবনে মধুর ধ্বনি , সুক্ষ্মতম সুরের তনু ।

ভাসবো না আর মায়াজালে , করবো না খেলা পুষ্পডালে

পোড়াবো তোমায় দাবানলে, মুঘলাই দাদ্‌রা তালে ।

শরীর শরীর করোনা গো - মনটা কোথায় যাবে

শরীর আমার নষ্ট হল --বসন্ত বৈভবে ।

কায়াহীনের কাব্য

ছায়ারা দীর্ঘ হয় , দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর

লম্বা হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ফেলে চাঁদটাকে

তারপর চাঁদকে দুমড়ে মুচড়ে একফালি

জোছনায় মুড়ে ছুঁড়ে দেয় খোলা আকাশের নীচে।

ভাঙা চাঁদ জানালা দিয়ে আমার বিছানায় এসে পড়ে।

উদিচী অবচী প্রভাত গোধুলী মিলে মিশে একাকার

কায়াহীনেরা উদ্দাম--- বিলাসে বাসনায়

শ্যান্ডেলিয়ার ঝালরে .....

আঁধারের মান রাখতে, নিরন্তর মোমবাতি নেভায় ,কোথাও কেউ--
আর এদিকে - সেই সুযোগে আমি লিখে চলি ,ছায়াদের প্রলম্বিত হবার কাহিনি ।

ধর্ম

পাথরে পাথরে গেঁথেছো প্রাণ

নাম দিয়েছো ভগবান

ভগবানের নেশায় মাতাল আলী সেলিম দিলশাদ

দুর্বার নেশায় তুলছে, একের পর এক ধর্ম বাঁধ ।

ধর্ম মানে ধারণ করা-ধর্ম মানে অকুতোভয়

ধর্ম ডান্ডা ঘুরিয়ে বিশ্বভয়-নয়কি তোমাদের পরাজয় ?

আজ ম্যাডোনা কাল ব্রিটনি

তোমাদের ভয়ে সবাই কম্পমান

ইজরায়েল থেকে যীশু দরবার- ছায়াভূত হয়ে ওঠে শ্মশান ।

ফাদার স্টেইন্সকে অকালে করেছো ছবি

মাদার টেরেজাকে করেছো স্বর্গের দেবী ,

তোমরাই কি মানুষকে ভুল পথে চালিত করনি ?

মুখে ফোটে খৈ, ফোটে মূর্দাবাদের বাণী । প্রেম কৈ ? কৈ ??

ভগবান কি তোমাদের কেনা গোলাম ?

কোরান লিখেছো ধর্মভীরু তোমরা ?

ঈশ্বর ফুলের মধু তিক্ত নয়- বুঝেছো

রহিম ফারদিন লাদেন তোমরা ?

ছল

যাবে কোথায় বলতো ?

আকাশটা মাথায় নিয়ে যদি পালাও

দেখবে আকাশের এককোণে সেই বাদল মেঘ ,

ঝোড়ো বাতাস , সেই সব শিথিলতা , সেই সব বারুদ ।

গোলাগুলি , কান্না , বন্দুকের নল ।

আকাশ ছেড়ে যাবে কি করে ? প্লুটোতে তুমি সুখে থাকবে ?

তোমার বাতাস লাগেনা ? অক্সিজেন , ক্লোরোফিল ?

যদি নদীতে ডুব দাও , হারিয়ে যাবে ।

ওখানেও মড়ার খুলি , কাটা হাত পা , দানবীয় চেহারার

লোলুপ হাঙর , হাঙরেরা থাবা বসায় জলের নিচে ।

যদি বিমানে পালাও ?

শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য পার হতে হবে ।

বিমান ভেঙে পড়লে ক্ষুধার্ত জানোয়ারেরা তোমায়

ছিঁড়ে খাবে , কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবে উগ্রপন্থা , হানাহানি , বিদ্বেষের বীজ ছড়ানো

ভুবন ছেড়ে ? তার চেয়ে এসো রাতের আকাশে, তারাদের জেগে ওঠা

দেখতে দেখতে -আলিয়া ভাটের রঙীন , চান্দেরী ওড়নায়

মুখ ঢাকি , যতক্ষণ পারি ।

সহজ যোগ

আজকাল সহজেই সমাজের শিখরে ওঠা যায় ।

সফটওয়্যার কিংবা আউটসোর্সিং এর হাতে ধরে

সহজেই হওয়া যায় লক্ষপতি ।

দেশের সীমানা পার না করেই

পাঁচতারায়, আলো আঁধারি ঘেরাটোপে

ছুঁয়ে ফেলা যায় বিলিওনেয়ারের হাত ।

উষ্ণ কফির কাপে কুয়াশা যখন

বেগুনী লিপস্টিকের লালাভ আভায়

এঁকে ফেলা যায় দীর্ঘ চুম্বন কোনো এক
Honcho মানবের মুখে ।

কিংবা নৈনিতালের ক্রেজি দৃশ্য ছাড়িয়ে

চলে যাওয়া যায় সুদুর বেলজিয়াম, পিরামিড নগর মিশর

অথবা রেড -সির সৈকতে ।

টাকা ডিগবাজি দিয়ে পাঁচিল ছাড়ায়

টাকা পাঁচগুণ হয়ে যায় তখন ।

টাকা মোড়া বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন

সহজেই খুঁজে নেয় আরামকেদারায়, নরম গদির

তুলতুলে মায়াবী আদর ।

হয় গ্যারাজ, আসে হন্ডার গাড়ি , আসে বিদেশী বধূ

হরিপদ কেরানীর তুলসী মঞ্চে শাঁখ বাজায়

মেম বৌ , টুনি বৌ সেজে ।

তুলসী পাতাও টাকা উগরায় ।

শর্টস পরা - উচ্চমাধ্যমিকে ডিগবাজি খাওয়া বাবুয়ানা ভোম্বল

শেফালি আলোয় একমনে টাকা কুড়ায় ।

সহজেই হয়ে ওঠে যাযাবর সমাজপতি ,গলা বাড়িয়ে দেখে নেয় শিথিল সমাজের

খেটে খাওয়া নষ্ট চাঁদ আর যুথবদ্ধ , *ব্লু-কলার* চাকুরেদের ।

তসলিমা

মেয়েটির ছিল একটি
শব্দভেদী বাণ ।

বাণ শব্দভেদ করলো

ঘন বনে--হায়নারা তেড়ে এলো ।

কোন হায়না মারা যায়নি !

হায়না নিধন যজ্ঞ বন্ধ করতেই

মেয়েটি তীর চালিয়েছিল ।

যুথবদ্ধ হায়নারা বোঝেনি, বোঝেনি নিজ অস্তিত্ব হারানোর খেলায়

নিজেরাই কিভাবে মেতে উঠেছে ।

তাই আচ্ছন্ন হল সমস্ত বোধ----

চেতনায় -অসভ্যতার কোমা ,

তোমার জন্য , তসলিমা !

গোরস্থানেও জীবন শুরু হয়

কবর -এ আমি বাঁচার রসদ পাই

ঝিলমিল ঝিলমিল চাঁদের আলোয়

শ্বেতপাথরের কবরগুলো

তখন চকচক করে ।

দেখি ইরানী নক্সাকাটা কাঠের বাক্সটা

কে বার করে এনেছে--ময়না তদন্ত হবে বলে ।

সন্দেহ ঘনীভুত হয়েছে ----

যখন তুমি সজীব ছিলে ,তোমায় তো জানতাম না ,

যখন তুমি সতেজ ছিলে ,তোমায় মানতাম না ।

আজ পড়ন্ত বেলায় খুব কষ্ট হয় তোমার জন্য

কবে আমায় ডেকেছিলে , কবে কি বলেছিলে

স্পষ্ট মনে পড়ে ।

এই যে ওরা কাঠের বাক্সটা টেনে হিঁচড়ে

বার করলো , আমার প্রতিটি রোমকূপে

আমি ব্যাথা অনুভব করলাম , জানো !

মৃতরাও কথা বলে , হাসে , সেন্সেশান ছড়ায় ।

গোরস্থানে না এলে, অজানা থেকে যেতো

অজানা থেকে যেতো তোমার প্রতি টান ,

সরল অনুভূতি ,

তোমাকে হারাবার নিদারুণ কষ্ট !

সার্কিটের নীরব সাইড- কবর খুঁড়তে না এলে

জীবনভোর --অধরাই থেকে যেতো ।

ছায়ার ফ্রাস্টেশান

মিসেস পত্রনবীশ রত্নভান্ডার মেলে ধরেন

ছাতিম গাছতলে প্রতি ঊষায় , ভেড়া গরু কেনা বেচার মেলায়, ভুবন ডাঙায় ।

মেলাটায় আর কোন গাছ নেই , ধূ ধূ প্রান্তর

মাঝে মাঝে অন্ধকার করে, বালির ঝড় ওঠে ।

মিসেস পত্রনবীশ আলোর কথা বলেন , বালিস্তুপ উড়ে

ছায়া টলটল করে ।

রাত্রির কালো পোশাক যখন ঢেকে দেয় ভুবনডাঙার মেলা

অবিরাম চাঁদকে ঢেকে , ভেড়াদের করুণ চোখের দিকে চেয়ে ওর মায়া বাড়ে তাই

আলোর কথা বলেন। পত্রহীন গাছের মতন একাকী দাঁড়িয়ে মিসেস পত্রনবীশ --!

ছায়া লোপ পায় শীর্ণ গাছের শাখায় শাখায় ।

আমি অর্বাচীন । ওর আলোর ঘ্রাণ নিতে চাওয়া, প্রায় আলোময় কথাগুলো

আমাকে বলবার সুযোগই দিলো না যে ছায়া তুমি , তুমি শীতল , শ্রান্ত পথিকের বড় ভরসা । তুমি ছায়ায় আছো , ছায়া ঐশ্বর্যেই থেকো ---

নাহলে ভেড়াদের দ্যাখো , ওদের কে টেনে নেবে ?

তুমি আছো বলেই আছে আলো ।

আর--তুমি তো গাছ নও যে সালোক সংশ্লেষের জন্য আলোয় যেতে হবে !

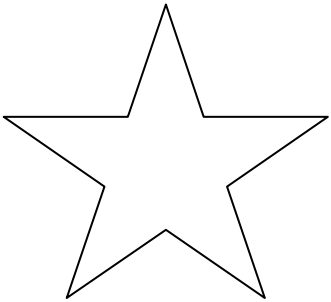

বিষুবরেখা

বাদামী খাঁজ কাটা পাহাড়ের সবুজ উপত্যকায় এক ফাঁকা মাঠের ওপরে ভাঙা বাড়ি। তার একদিকে নতুন দালান। সেখানে একফালি বদ্ধ ঘরে অল্প আলো। সামনের বারন্দায় মোটা আচ্ছাদন। জানালার কাঁচ বন্ধ। ঘরের বাইরে সদাব্যস্ত প্রহরী। টেলিফোন লাইন কাটা। ইন্টার্নেট বন্ধ। রান্না বান্না বাজার হাটের পাট নেই। নেই অতিথি আগমনের ঘটা। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থেকে খাবার আসে। রুটি , তড়কা , কাঁচা পেঁয়াজ , টক দই। অথবা মাটন কিংবা গোস্ত বিরিয়ানি।

লায়লা খান। গৃহবন্দী সোসাল অ্যাক্টিভিস্ট। ৩৮ পেরোনো লায়লার মুখখানিতে এক অদ্ভুত সারল্য মাখানো, দেখে মনে হয় পাশের বাড়ির কোনো মেয়ে । গোলাপের পাপড়ির মতন রং , তুলতুলে দেহ , ঈষৎ চাপা নাক কিন্তু মুখে মিষ্টত্ব আছে। অনেকটা আমাদের বলিউড সুন্দরী মনিষা কৈরালার মতন দেখতে। প্রথম দর্শনে মনে হবে ইনি কোন অভিনেত্রী কিংবা কোন শিল্পীর Muse – কিন্তু নাহ্ ! ইনি আদতে একজন নারীবাদী , সমাজসেবিকা। ওঁনার সংগ্রাম মেয়েদের নিয়ে। ওঁনার সংগ্রাম সমাজে অবহেলিত , পতিত নারীদের নিয়ে।

দূর্বলদের নিয়ে । অবশ্যই মেয়েদের উনি দূর্বল বলতে নারাজ । আজ উনি গৃহবন্দী। কারণটা কিছুই নয় সমাজে অত্যাচারিত মহিলাদের হয়ে উনি ইগোর দাস পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

তাই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ওঁনাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তাই উনি আপাততঃ একটি শহরে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছেন।

জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে ওঁনার। কোথাও যাবার উপায় নেই। কারো সঙ্গে দেখা করবার উপায় নেই , বন্ধুবান্ধব , আত্মীয়স্বজন সবাই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। আছে শুধু একরাশ হতাশা , একাকীত্ব। নিঃসঙ্গ , নিরালা লগ্ন। ভালো কাজের এই ফল ? এই শাস্তি ? ঈশ্বর ব্যাটা কোথায় এখন ?

লোনলিনেস যে এত ভয়াবহ আগে জানা ছিলনা। কারণ আগে কোনদিন একা কাটাতেই হয়নি ! প্রথমে পড়াশোনা , তারপর চাকরি , তারও পরে নিজের কর্মজীবন থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে এন জি ও খুলে জনহিতকর কাজ ,সব সময়ই সময়ের টান পড়তো। মনে হত দিনটা ৪৮ ঘন্টার হলে বড়ই ভালো হত। আর আজ মনে হয় দিনটা কি ভীষণ লম্বা ! ঘড়ির কাঁটা যেন নড়েই না। একা একা বসে সময় কাটায় লায়লা। মনে হয় তার যে সংগ্রাম সেটা কি কোনো ভুল পদক্ষেপ ? অনেকেই বলেছিল তাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। রাজি হয়নি আরো একটা নরকের কীট পুরুষ ইমরানের কাছে মাথা নোয়াতে। জনকপুরের রুলিং পার্টির নেতা ইমরানের পুত্র গাপ্পা প্রথমে লোকজন জুটিয়ে আরম্ভ করে ঝামেলা। অভিযোগ , লায়লা রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। রাজনীতির প্যাঁচে লায়লা পর্যদস্তু। যখন ষড়যন্ত্র বাড়লো লায়লা বিদেশে পলায়ন করলো। ওর প্রথম স্বামী হামিদ ওকে আগেই ছেড়েছিল। হ্যাঁ ,বলা হয়নি এই লায়লা সেই ইতিহাসের লায়লা নয়। এক ভিন্ন চরিত্র। তাই এর জীবনে অনেক

মঞ্জনু । তো প্রথম মঞ্জনু কেটে পড়েছিল এর লড়াই করবার অ্যাটিটিউড দেখে । মেয়েরা হবে নরম সরম , সুকোমল , পুরুষের এক আঙুলের ইশারায় উঠবে , বসবে , নাচবে , গাইবে । তা নয় এ লড়াই করে হিউমান রাইটস্ নিয়ে । ভরা বাজারে গলা ফাটিয়ে মাইকে সমতার বুলি কপচায় , বলে : নারী পুরুষ সমান , সমান । আমি এই ধরিত্রীর বুকে মানবজাতির ওপর একটি বিষুবরেখা টানতে চাই ! ছেলেও মানুষ , মেয়েও মানুষ --শুধু মেয়েমানুষ নয় তারা ।

বিদেশ থেকে এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে লুকিয়ে এসেছিল সে পড়শী দেশে । তারপর রয়ে গেছে সেখানেই । আলাপ হয়েছে বিনোদের সঙ্গে । এক অভিজাত পাবে । বিনোদ কর্পোরেটদের মেয়ে সাপ্লাইয়ের মহৎ কাজ করতো । নিজে বিয়ে করেনি । দাবী করে সে ভার্জিন পুরুষ । হতেও পারে , লায়লার মনে হয় হতেও পারে ।

মার্চের শেষে হিমালয়ে একটি রাত । বসন্তের আগমনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় অভিসারের ডাক । বিনসরের মহীন্দ্রার কটেজে আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি প্রাণ । নগ্নিকার গোলাপী ঠোঁটে দীর্ঘচুম্বন এঁকে দেয় সঙ্গী পুরুষ । তারপর স্তনের আগায় আলতো চাপ -- এই সুড়সুড়ি লাগছে বিনোদ ! কি করছো ? কতবার না বলেছি পুরো বুকটা ধরে টিপবে , আরাম লাগে, তা নয় বোঁটায় আঙুল বুলানো , বুলালে সুড়সুড় করে যে !

- আমি সেক্সের বইতে পড়েছি ডার্লিং হাউ টু এনজয় সেক্স ।
- সব কথা বইতে লেখা থাকেনা বিনস্ , আমার তো একটা আরামের ব্যাপার আছে নাকি ? ডু ইউ ওয়ানা স্যাটিসফাই মি অর নট ?
- হ্যাঁ, লালি আমি তো আনকোরা , তুমি অভিজ্ঞ , তোমার তো এটা দ্বিতীয় । বিনোদ অপরাধী অপরাধী মুখ করে বলে । লায়লা ওরফে

লালি হাসে , মনে মনে বলে দ্বিতীয় সেটা তুমি জানো কারণ ব্যাচমেট সুহাসের সঙ্গে নিভৃত দিনযাপন কিংবা জাভেদ স্যারের আগুনে পোড়া পত্নীর শারীরিক সম্পর্ক না করতে পারার অভাব মেটাতে তার সঙ্গে যৌনক্রীড়া--এগুলো তো তুমি জানোনা গো , ভালোমানুষের পো আমার !

সেই বিনোদের সঙ্গেও সম্পর্কটা চুকে গেলো একদিনে । সামান্য ঝগড়ার জন্য । পরিণত বয়সের মানুষেরা নাকি ঝগড়া করেনা , মতের আদান প্রদান করে, কোথায় যেন পড়েছিল লায়লা । কিন্তু বিনোদকে দেখলে সেটা মনে হবেনা । খুব রেগে যেত ও মাঝে মাঝে , হয়ত মেল ইগোতে আঘাত লাগলে । সেদিন তর্কটা শুরু হয়েছিল এই নিয়ে যে কার প্রয়োজনীয়তা বেশি ? নারী নাকি পুরুষ ।

লায়লা যুক্তিবাদিনী । তার যুক্তি , সোমাটিক সেল থেকেও অফস্প্রিং জন্মাতে পারে -- **curvaceous country western singer** ডলি পার্টনের বাস্টলাইন দেখে যে ভেড়ার নামকরণ করা হয়েছিল ডলি -সেই তার প্রমাণ । কাজেই পুরুষ জুতোর বুরুশ ব্যাতীত কিছুই নয় । সাফ করলে ভালো , নাহলেও কিছুই যায় আসে না ।

তুমুল বাক্‌বিতন্ডা এবং ছাড়াছাড়ি । লায়লারও তো একটা ফিমেল ইগো আছে কিনা ? কিছুদিন ঘুরঘুর করেছিল , লায়লা পাত্তা দেয়নি । চিটেগুড়ের মতন চ্যাটচ্যাটে পুরুষ গুলো । ঘেন্না হয় । তবুও দেহের তো একটা চাহিদা আছে ! ব্যাটা ভগবান না কে যেন এইসব নিয়ম চালু করেছে । যতসব । নারীদের একবারে মেরে দিয়েছে গা ? ভগবান ব্যাটাও তো ছেলে !

তৃতীয় পুরুষ সলমন । লায়লার সিকিউরিটি । ততদিনে লায়লা মেয়েদের , শিশুদের রাইটস্ নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে বেশ বিখ্যাত । কয়েকবার রাজনৈতিক হামলাও হয়েছে । মাথায় লাঠির আঘাতে বেশ কিছুদিন হাসপাতালের বিছানায় বেহুঁশ পড়েছিল । তারপর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল । সেই নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গেই সেক্স । লায়লা ছোটবেলা থেকেই একটু কামুক । গড়পরতা বাদামী ,সহনশীলা নারীদের মতন নয় । বান্ধবীদের বলতো --আমার স্বামী যদি আমার যৌনক্ষুধা মেটাতে না পারে, আমি অন্য পুরুষে যাবো । ছেলেরা তো যায় , আমরা গেলেই দোষ ? আমি সোনাগাছির মতন রূপাগাছি খুলবো তখন ।

দীর্ঘদিন যৌনজীবন যাপনে অসমর্থ লায়লা বেছে নিয়েছিল সুপুরুষ সলমনকে । ঘরের ভেতরে ক্লিভেজ বার করা পোশাকে- লায়লার সলমনকে বশ করতে বেশি সময় লাগেনি । চলতো অবসরে সঙ্গম । লায়লা আক্ষরিক অর্থেই রক্ষিতা তখন । পুরোপুরি গচ্ছিত সলমনের কাছে । সলমন নিজে উদোম হয়ে লায়লাকে উদোম করতো । বলতো , তোমাকে সবসময় ল্যাংটো করে রাখবো মেরি জান ! দুনিয়া জানবে না যে পুরুষ বিদ্বেষী , বীরঙ্গনা লায়লা সুন্দরী এই বডিগার্ডের কাছে পুরোপুরি কেন্নো ।

লায়লা সলমনে সমর্পিতা হয়েও মনে মনে হেসেছিল সেদিন ।

লায়লার অনাবৃত, অভিমানী কৃষ্ণ বদ্বীপে অঙ্গুলি সঞ্চালনের সময় সলমন কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হয়ে বললো --

তুমি আমাকে ভালোবাসো লাইলি , লাভলি ডিয়ার ?

--নাহলে সব দিলাম কি করে সাল্লু ? মিষ্টি বক্র হাসি লায়লার মুখে ।

মনে মনে অবশ্য বলে একদম ভিন্ন কথা।

পুরুষ কি ভালোবাসার যোগ্য ? তোরা শালা ঘেয়ো কুত্তার জাত। মেয়েদের পেছন কিছুতেই ছাড়িস না ! তোদের বিয়ে হোক না হোক তোরা বুনো পশুর মতন হিংস্রভাবে নারীকে গিলে খেতে আসিস। আমাকে যে সে নারী পাসনি। মূর্খ পুরুষ ! তোকে ভোগ করে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমার বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না !

দিলোও তো। কিছুদিনের মধ্যেই সলমনের বদলী করালো অটোগ্রাফের খাতায় অভ্যস্ত , রূপসী সমাজসেবিকা , সেলিব্রিটি লায়লা। পাহারায় গাফিলতির অভিযোগে। যার হাতটা ধরার জন্য লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মহিলা আগ্রহী। গ্রামে গঞ্জে , হাটে বাটে।

স্বামী ধরে ঠ্যাঙায় , মদ্যপ স্বামী অত্যাচার করে , সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার বিয়ে করে -মোটা পণের জন্য বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে , এম এন সির- ভাইস প্রেসিডেন্ট বৌকে ঘরে রেখে ফার্মহাউজে অন্য নারীর সঙ্গে রতিক্রিয়া রত , বৌ কার কাছে যাবেন ?কেন লায়লা খান !

সমস্ত অরাজকতা ভেঙেচুরে এক ডান্ডায় খান খান , লায়লা খান।

পুরুষকে, শোলে এস্টাইলে -অনেক নারীকুল ভয় দেখাতো--- সো যা চুপ চাপ আদমি , লায়লা গব্বর আ রহি হ্যায়।

সেই নজরবন্দী লায়লা খান একদিন পালালো। পালালো সিউকিউরিটি কে কাঁচকলা দেখিয়ে। বোরখা পরে পলায়ন করলেও পরে সে হল এক মুক্ত নারী। বদ্ধ ঘরের চারদেওয়াল থেকে মুক্ত হয়ে বিহঙ্গের মতন ডানা মেললো

সুনীল আকাশে । পালিয়ে চলে এলো ওর নিজের দেশে । যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ ছিল ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের জন্য , যারা ওর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল । কিন্তু আশ্চর্য ! কেউ ওকে ছুঁলো না , কাছেও এলো না । মারা তো দূরের কথা । যেই পার্টির কর্মীরা ওর শিরের দাম ধার্য করেছিল ১০ লক্ষ টাকা তারা সবাই সুড়সুড় করে পালিয়ে গেলো ওকে দেখেই ।

লায়লা এখন মুক্ত পরী । লায়লা নিজের সব প্রিয় প্রিয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখে । লায়লা বাঁশমতী নদীর তীরে বসে তাজা বাতাসে নি:শ্বাস নেয় ।

কফিহাউজে যায় , আড্ডা দিতে কিন্তু ডাক্তার পরভেজ আলি ব্যাতীত কেউ হ্যান্ডশেকও করেনা । সবাই দূরে দুরে থাকে । যাকে ধরার জন্য এত হম্বিতম্বি সে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি কিন্তু কেউ ফিরেও চাইছে না ।

কাজকম্মো বন্ধ হয়ে গেছে সে তো অনেকদিন । লায়লা কিন্তু প্রকৃতির কোলে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে । অনেক হালকা সে আগের চেয়ে । বদ্ধ ঘরের দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশ থেকে এই ঢের ভালো । অন্তত: যে কটা দিন আর বাঁচে ।

মড়ার ওপর খাড়ার ঘা মেরে লাভ নেই । বিরোধীরা তাই সরে গেছে । অনুরাগীরা সরে গেছে ভয়ে । শরীরটা খারাপ হতে শুরু করেছিল হঠাৎই । তারপর হাসপাতাল , নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অবশেষে এই সিদ্ধান্ত ।

ড্রাগসের সূঁচ থেকে নাকি কোন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে অসতর্ক যৌন মিলনে জানা নেই লায়লার , ভয়ানক অসুখ এইডস এসে বাসা বেঁধেছে তার শরীরে । এখন শুধু শেষের সে -দিনের অপেক্ষা । আজ কেউ তাকে খোঁজে না ,

কেউ ওর সন্ধানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে না। তবুও আজ মুক্ত হয়েও সে বন্দী , রক্তরোগের কারাগারে। বিষ সঞ্চার হয়েছে তার দেহে। ছেয়ে গেছে সমস্ত সত্তায়। যাদের জন্য সে জীবনপণ করে এতো লড়াই করলো , আজ তারাই তাকে এড়িয়ে চলেছে শুধুমাত্র রোগের ভয়ে। নিজেদের জীবন রক্ষার ভয়ে। আর বিরোধীরা আজ তাকে করুণা করছে।

নারী স্বাধীনতার অর্থ বোধহয় স্বেচ্ছাচারিতা নয়। কুসুম তো স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। তবুও দুটিতে খুবই খুশী। কুসুমের কোন অভিযোগ নেই স্বামীর প্রতি আর নারীবাদীদের সম্বন্ধেও সে আগ্রহী নয়। আবার পরভীন , ও তো বেরিয়ে এসেছিল মৌলবাদীদের করালগ্রাস থেকে। কিন্তু ও নিজেই আজকাল বলে যে -প্রতিটি পদক্ষেপে ওকে সমাজে, পুরুষের এতটাই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় যে আজ ও স্বাধীন হয়েও পরাধীন। ওর কাছে নারী স্বাধীনতার কোন অর্থই নেই আজ।

লায়লা আজ বুঝতে পারে পতির রোজগারে নির্ভর করেও একজন নারী স্বাধীন হতে পারেন। আবার বহু পুরুষের বাহুলগ্না হয়েও পরাধীনতার শৃংখল বেষ্টিত হতে পারেন নারী। সবটাই নির্ভর করে নারীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও কি ধরণের মানুষ দ্বারা সে বেষ্টিত তার ওপর।

পুরুষের সাহায্য না পেলে কি নারী প্রথম বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারতো ?
সেও তো কোন পুরুষই ছিল ! আর সব পুরুষ রেপিস্ট হলে এই

২০০৭ এও কি মেয়েরা বাইরে কাজ করতে পারতো ?

রাজা রামমোহন রায়,বিদ্যাসাগর, নেতাজী, রাসবিহারী বোস ,রাণাপ্রতাপের বাবা-যাঁর প্রশ্রয়ে তাঁর মা -রাজপুত রাণী ,নিজ স্বামীকে রাজ্যপাটে সাহায্য করতেন - সবাই তো পুরুষ। আর সমস্ত ছেলেরা শয়তান ও লম্পট হলে

এইভাবে মেয়েরা দলে দলে বাড়ির বাইরে আসতে পারতো ? পারতো না। বুদ্ধিমতী লায়লা, আসলে যশস্বিনী হবার সস্তা একটা রাস্তা চেয়েছিলো। চালিয়াতি করে বা না নেকিয়ে অন্য একটা পথ ধরেছিলো। অ্যাগ্রেসানের পথ এই আর কি !

আসলে পরাধীনতা নারীর হয়না , হয় বোধহয় চিন্তাধারার। চিন্তাধারা স্বচ্ছ ও সুন্দর হলে বাড়ির মধ্য থেকেও সে নারী হতে পারেন স্বাধীন ! নাই বা বুক খোলা জামা পরে, পুরুষ বেষ্টিত হয়ে গেলেন রং চঙে পার্টিতে। নাই বা করলেন কোকেন , সিগার , সুরাপান !

মানুষকে মানুষের সম্মানটা দিলে সমাজও একদিন তাকে স্বীকৃতি দেবে অন্তত: ভালোমানুষ হিসেবে। ভালোমানুষ হওয়া ও আনন্দে থাকা এই তো জীবনের লক্ষ্য !

সে তো আজ দেখছে একমুঠো আনন্দকে সে কেমন লুটেপুটে নিচ্ছে , বহুদিন পরে খোলা নীল আকাশের নীচে ! খোলা পোশাকের চেয়ে খোলা নীল আকাশই তাকে সুখ দিচ্ছে।

বেদান্তে পড়েছিল যে এই দুনিয়ার সব জীব - এক ও অবিচ্ছেদ্য এবং গোটা সভ্যতাটাই একটা সংসার - বসুধৈব কুটুম্ববকম্। মানবদরদী কমিউনিস্টরাও তো একই দর্শন প্রচার করেন। মানুষের বেসিক রাইটস্ নিয়ে বলেন , লড়াই করেন, জনচেতনা বাড়ান। সবাই ফুড, শেল্টার আর ক্লথিং এর দিক থেকে সমান। তাদের মধ্যেও সবাই স্বেচ্ছাচারী নন। লম্পট নন। চে গুয়েভারা , ফিদেল কাস্ট্রো , ট্রটস্কি এঁরাও তো পুরুষ।

বাংলার বাঘ-- স্যার আশুতোষ মুখার্জি , লৌহমানব বল্লভভাই পাটেল , শচীন ও বিজয় তেন্ডুলকার সবাই তো পুরুষ !

রিয়ালিটি হল ----বাস্তবে সমতা আনা বড় সহজ কথা নয়, আনা যায় কি ? অসমতা না ভেবে যদি সেটাকেই সমতার ভিন্ন রূপ বলে ভাবা হয় ? পদ্ম যেমন সুন্দর, ক্যাকটাসের সৌন্দর্য্য নিজ শুষ্কতায় ।
বসরার গোলাপ অথবা ডুবাইয়ের ক্যাকটাস্- আপন ভুবনে মাধুরী ঝরার ।

গোলাপের,ক্যাকটাস হতে চাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক ধরণের হীনমন্যতা। কিন্তু গোলাপ কী চায় তা কি মানুষ বোঝে ? মানুষ শুধু নিজের ধারণা গোলাপের ওপরে চাপাতে জানে ।

প্রকৃতি দাগটা টেনে দেয়নি তাই তাত্ত্বিকেরা বিষুবরেখাটা
কল্পনাই করেন , সত্যিই ওটার কোন অস্তিত্ব নেই ।

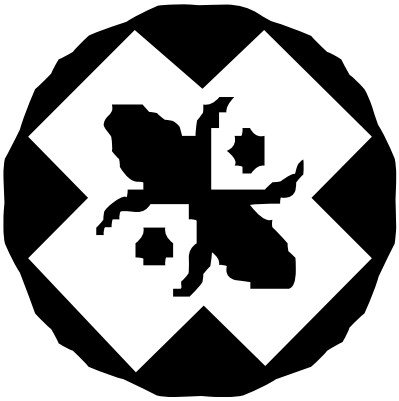

মানুষী

জীবন ক্লোরোফর্ম মাখা শীতল যাপন ।

রাস্তায় রেবিড সারমেয়র উচ্ছাস-- নাচন

জীবন ভয় পায় , গুটিয়ে যায় ।

চাষীর জমির সবুজ ফসলেও কীটনাশক বিষ ।

মৃত্যুর দ্যুতি কি একে বলে ?

জগত জুড়ে খেলে বেড়ায় হিংসার বীজ

মাফিয়া রং , নীল কালো- তীব্র কালো ।

শিশুমেধ ও পশুবধ যজ্ঞ শেখায়

শাসক শ্রেষ্ঠীরা ।

আমরা তবু কবিতা লিখি , মেধার নেশায় ।

সদা জাগ্রত সহস্র চোখ ,গহীন সাগরের বুকে এঁকে চলে মারণাস্ত্রের সর্পিল রেখা ।

দড়ি ধরে মারি টান । দড়ি ছিঁড়ে যায় ।

নিষিদ্ধ যাপন ও কুল ভাঙার টান পিছলে

সতেজ লাউটা , মূলোটার খোঁজে

আদিবাসী হয়ে খুঁজে চলি আবীর লাল আকাশ ।

বেকার সংবিধান ভাঙা ,বরফহীন পৃথিবী -প্রচন্ড তাপে পুড়ে গিয়ে হয়
পোড়াকাঠ , বাঁচিয়ে রাখতে চাওয়া সোনালী পোষা ময়নাটা ততক্ষণে

পিঞ্জরে মৃত্যু -ম্লান ।

গাছের কান্না

গাছটি কথা বলতো,

গাছটি হাতছানি দিতো ।

বসন্তে , পাতাঝরার ক্ষণে সে কাঁদতো ।

গাছটির সুখের সাথী দু:খের সাথী আমি,

এই আমি অবলা নারী ,

শহর কলকাতার বকুলবাগানের বাসিন্দা ।

বকুল গিয়েছে ঝরে ,

বকুল ফুলের গন্ধ , মন দর্পণে ।

মানিনীর রাগ হয়েছে ,

সবুজ শরীর থেকে চুইয়ে পড়ছে

সফেদ ফেনিল রক্ত ।

কথা বলেনা তাই , কথা আসেনা আর -আমা সনে ।

প্রদক্ষিণ করি ওকে ,

ছায়াহীনতায় ঘুরে মরি ,

পাতারা চলে গেছে নীল দিগন্তে

মারোয়ার বাসী--মালিকের কারখানার আড়ালে ।

চুড়ি ঝনঝনিয়ে , ঝুনঝুনওয়ালা গৃহিনী

ঈষৎ হেড়ে গলায় বলে ওঠে ,

গাছটা কেটে ফেলা হল, অনেক পাইসা লাগলো ,

কে যে সোহোরে গাছ লাগায় ! বেওসা হবে কোথায় ?

নগর সুন্দরতর করার প্রয়াসে-গাছেরা অর্বাচীন ,

পরিধি টেনে দিয়েছে ঝুনঝুনওয়ালার পৃথুলা ঝুনঝুনওয়ালি ,

গাছেরা সাবধান ,এবার পৃথিবীতে মাটি খরিদ করতে হবে গো , মাটি ---ওগো গাছেরা ,

দেখছো না শিল্পপতিরা পাহাড়ও কিনে নিচ্ছেন !

নতুন দিনের মানুষ

আগামী মানুষ কেমন হবে ?

তার গায়ে নরম চামড়া থাকবে ?

অস্থি মজ্জায় পলাশ ধোয়া রং ?

তার ক্ষিদে পাবে ? তেষ্টা ?

কাম থাকবে ? ক্রোধ ?

দূর্বার প্রেম ?

তার মান অভিমান হবে ? সে কি ভাবুক হবে ?

সূর্য প্রণাম করবে ? গাইবে ? নাচবে ? খেলবে ?

ক্রিকেট অথবা বেসবল ?

জানতে ইচ্ছে করে ,ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে ---

প্রজাপতির রঙীন পাখনা অথবা জোনাকের ডানায় ভর দিয়ে
আগামীদিনের মানুষ কি উড়তে পারবে

নির্মল বাতাস মেখে সুনীল আকাশে ?

নাকি দিন কাটাবে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি পথ বেয়ে

যুথবদ্ধ কোন ডিজিট্যাল নির্বাসনে !

তুমি কি একটি গাছ ?

অনেক দিন পর তোমায় দেখে মনে হল

একটি বিশাল গাছ ।

বট নাকি শিমূল আমি জানিনে ।

তোমার শাখায় শাখায় দুরন্ত অতীত

তোমার পাতায় বয়ে যাওয়া সময়ের সবুজ মলিনতা

তোমার শিকরে খনিজ কাঠিন্য

দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে তারা ।

কেউ কোথাও মাথা গোঁজার জায়গা পেয়েছে

আপন করে নিয়েছে সেই মাটিটুকু ।

চোরাবালির হাতছানিতে ভুলে হারিয়ে গেছে কেউ

অসীমে ,

তারাও তো তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল একদিন !

তোমার সাথে পাখিরা সোহাগ করে ।

তুমি তো হাসলে না !

ওদের তাৎপর্যময় প্রাণের গান

শুধু বিষবৃক্ষ রোপন করে গেলো ।

হে বট বৃক্ষ ! আধাশহরের ঐ ঝুপড়িটায়

টাপুর টুপুর বাজনা , ঝরে পড়ছে তোমার ডালপালা থেকে ।

খুশী হলাম জেনে যে তুমি কাঁদতে ভুলে যাওনি !

প্রাচীন হলেও তুমি অনুভবে আছো ।

পাস্ট লাইফ

কবিতা লেখা বড় শক্ত ।

তবু ভাবনার ভারে ঝুঁকে আমি

ভাবি পুরনো সেই দিনের কথা ।

সেই ইস্কুল বাড়ি , পিটি স্যার ,

আঁশটে ডিম আর টোস্টে ভরা টিফিন বক্স ,

চু- কিত্‌কিত্‌ খেলার ছলে দিদিদের সাথে মারামারি ।

পৃথুলা মিস্‌ মনরোর চাটি ,

এক ক্লাস উঁচুতে, কোন সে এক ফিল্মস্টারের মেয়ে পড়তো

আজ সে বলিউডের এক ভিলেনের গৃহিনী ,

তার লাল টুকটুকে গালে টোকা মেরে পালাতাম ।

আজ তাকে দেখি পর্দায় । ফ্যাশান শো -তে ।

আপেলের মতন রক্তলাল গালের পাশেই একবিন্দু নকল মুক্তোর দুল-

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে , মন্‌জারি নাহাটার ঋতু স্রাবে স্কুল বাড়ি ভেসে গেলো ।

ক্লাসে- রোমা, ভার্গবীর সঙ্গে রং- পেন্সিল নিয়ে লড়াই

আর কাড়াকাড়ি করে আচার খাওয়া ।

কোথায় গেল সেইসব দিন ?

হাজার কাঁদলেও ফিরবে না ওরা ।

যেদিন টিভিতে সিস্টার ছবিটা দেখানো হল

পরের দিন সবাই মিলে ছুটির সময় গাইলাম

- বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু , আমাদের প্রার্থনা এই শুধু তোমারই , করুণা , থেকে বঞ্চিত যেন হই না কভু ---

গানের শেষে কেঁদে ফেলেছিলাম , সব্বাই । মিসেস মার্থার মতন

গম্ভীর মিসও দু-চোখ , হাত দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলেন , বোবা কান্নায় ।

আমাদের সেদিনের সহপাঠী সৈয়দ ,

ও-ও তো গেয়েছিলো সেই গান ।

ওর ঠিকানা আজ এক কারাগার ।

শিমূল বনের সহস্র লালের মাঝে এক ফোটা সবুজের মত

জেগে আছে ও । শুধু জেগে আছে ।

আর কিছুদিন পরেই ,

ওর ফাঁসি হবে ।

বিশ্বপিতার গানটা ও আজও গায় ,

তবুও ওর ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন ওপরওয়ালা ।

উগ্র সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে, ওর গা থেকে ।

ভীষণ উগ্র গন্ধ , গা গুলিয়ে ওঠে আমার

গা গুলিয়ে ওঠে ।

এনকাউন্টারের গুলি বাঁচিয়ে ,এই যে গরাদ অবধি পৌঁছতে পেরেছে সৈয়দ --

আমি বলি কি - বিশ্বপিতা , তোমার করুণা থেকে শেষবারের মত তুমি ওকে বঞ্চিত করো, বঞ্চিত করো , বঞ্চিত কোরোনা ,

করো , কোরোনা ---করো

হে পিতা, পিতামহ ।

নর্ম্মদা কথা

নর্মদা , পূণ্যতোয়া

নর্মদা সুন্দরী

নর্মদা গৈরিক বসনা

নর্মদা চন্দন চর্চিতা ।

নর্মদা গুরুকূল

নর্মদায় স্নান করেন সপ্তর্ষিদল

শনশন হাওয়া বয়

নর্মদা কথা কয় ।

ভেঙে পড়ে যত ক্রোধ , শীতল জলে

বিন্দু হয়ে ভেসে যায় ঢেউয়ের তলে ।

সুক্ষ্ম দেহে বাস করেন তীরে যোগীবর

নর্মদা নদী নয় -তাঁদের ঘর ।

তিরতির সাদা ফেনা ছড়িয়ে

নর্মদা বয়ে চলে সূর্যের আভা মেখে

পুর্নজন্মের লোভে আসা ভক্ত দল

মৃত সঞ্জীবনী সুধায় প্রাণ চঞ্চল ।

বালুকাবেলা নয় নদীতট

সে যে তপোভূমি

নর্মদা দেবী বলে আমরা যাকে চিনি ।

মা গঙ্গা লুকিয়ে আসেন--সব পাপ ধুতে

নর্মদা -নীরে ডুবে , চান পাপ মুছে নিতে ।

তবু কেন নর্মদাকে বলি না পাপনাশিনী ?

গঙ্গাই পূণ্যসলিলা এই কেন মানি ?

আসলে নদী নর্মদা ওল্ড ফ্যাশানড্

আর গঙ্গার, পি আর এজেন্ট সব টুইট করেন ।

ইন্টেলেকচুয়াল

অরবিটে ঘোরে চাঁদ , পৃথিবী

কেন ঘোরে কেউ জানেনা ।

আমরা কেবলই রণ অভিলাষী ।

যুদ্ধ হয়, সংসারে , পথে ঘাটে ।

অশ্বিনী , শতভিষারা শুধু জন্ম কুন্ডলীতে নয়

মহাকাশের গ্যালারিতে তাদের দেখা যায় ।

কোন কৌতুহল নেই ?

সেখানেও কি মানুষ যেতে চায় ? জানা নেই ।

পাথর কাঁদে, গাছ হাসে, কথা বলে দোয়েল, ফিঙে , পারিজাত ফুল

ঐশ্বরিক মনে হয় তখন । নিজেকে পবিত্র মনে হয় । ওরা যে মিথ্যে বলতে জানেনা । ভারহীন , নির্মল , সোহাগাহীন সোনা । ওরা শুদ্ধ সোনা । মানুষ কি চায় ? কেন আকাশে আকাশে , দিবারাত্রি স্যাটেলাইটের ছবিতে , ধরার চেষ্টায় শত্রু কোন বিমানের , স্বদেশের আকাশে অযাচিত আনাগোনা ?

তখন যুদ্ধের দামামা বাজবে । যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

আপনাকে কি জানা হল আমার ?

পাতায় পাতায় , ফুলে ফুলে যে আমারই বিচ্ছুরণ ,

সবেতেই তো আমি , আমি আমি মন । শত্রুর সাথে আমরা ভালোবাসা দিয়ে যুক্ত । যুদ্ধের আগে ওদের দিকে তাক্ করো প্রেম বোমা !

দেখবে, ভয়ে কেমন পালায় ! কারণ ওদের মনে এত ঘৃণা যে প্রেম সলিলে ওরা ডুব দিতে গেলেই তলিয়ে যাবে ।

অস্তিত্ব সংকট সবখানেই । মঙ্গলগৌরি বা দশাশ্বমেধ ঘাটে যেমন , বিল গেটসের নকল মানুষ ল্যাবেও তেমন ।

ভাবো , এই আমি কে ? একবার বুঝে গেলে

ফুলের সৌন্দর্য্য , রঙের বিবরণ লেখা কবিতার

তেমন আর মূল্য থাকেনা ।

স্মৃতি

কলেজ প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতাগুলো ----

পাতাগুলো জড়ো করে দেখি

সেগুলি টিপে টিপে দেখি ।

সেগুলি ছিঁড়ে দেখি , জুড়ে দেখি।

পুরানো দিনগুলি ফিরে আসে কিনা ।

পাতাগুলো উড়ে চলে নিজের মনে

পাতাগুলো হেলেদুলে চলে

পাতাগুলো নাচে , গায় , চমকায় ।

এক একটা থেকে বেরিয়ে আসে হাসিমুখ ।

কোনটা লেলিহান বহ্নিশিখা ।

কোনটা গ্রামীণ সুন্দরীর নাকের নোলক ।

কোনটা সরল ছেলে ফটিকের আনন্দ জোয়ার

কোনটা দু:খ প্লাবন ,কেউ রুদ্ধ বাতায়ন

কেউ আশার ছলন ।

পাতাগুলো জুড়ে জুড়ে পূর্ণ চিত্র তৈরি হল ।

তবুও যেন ছবিটা সম্পূর্ণ হলনা ।

কারণ এসবই কল্পনা , কল্পনায় প্রাণ থাকেনা ।

স্মৃতি হয়ে থেকে যায় আমরণ ।

জীবন্ত হয়ে ফিরে ফিরে আসেনা ।

কেন আসেনা ?

ডিজিট্যাল জাল

শীততাপ , ইলেট্রনিক সাজ সরঞ্জাম

সব ডিজিট্যাল ডিজিট্যাল ।

ডিজিট্যালের ফাঁদে পড়ছে বিশ্ব ,

কিছু নেই অবশিষ্ট মেন্টাল ।

কথার পিঠে কথা -কথার ফুলঝুরি ,

কথা কাটাকাটি-তার আজ নেই প্রয়োজন ।

আজকাল কথা কেউ কয়না , সব ডিজিটে চলে ।

জিরো ওয়ান এই দুয়ে চলে বিশ্বজয় ।

কথা দিয়ে , কথা হারাবার নেই ভয় ,

বোবারও কোনো লজ্জা নেই, আমার সবাই তো আজ বোবা !

একে একে হারিয়ে ফেলছি শুন্যে শুন্যে শব্দ ভান্ডার , অভিধান ,

সাহিত্য কর্ম যত । এক জিরো ওয়ানের জাল ফেলেছি

ভুবনময় , এই জগৎ **গ্রে এরিয়া** থেকে মুক্ত ।

কান্না

মহাবালেশ্বরের কুঞ্জে স্ট্রবেরী কণিকাগুলি

ভেঙে পড়েছে ; সার দিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে

মনে হয় কাঁদছে ।

আকাশের নিষ্ঠুর শকুনি

নীরবে কাঁদছে ,

ওরা তো বিলুপ্তির পথে ।

কারো কান্না নোনতা , কারো কান্না ঘোলাটে

কারো নীল -কারো পান্‌সে ।

গাছের কান্না কিন্তু সবুজ নয় , সবুজের কান্না ।

কান্না সবুজ হয় একমাত্র কবিতায় ।

কবিতায় ক্লোরোফিল থাকেনা ,

থাকে মনের মাধুরী , তবুও প্রতিটি কান্নাই

স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে , সতেজ , জীবন্ত --

স্রেফ নির্মলতা মেখে ।

অলীক পথ এক

কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা লাল পথ

এঁকে বেঁকে আমার দরজা দিয়ে

ঢুকে গেলো সোজা ঘরে । দরজাটা লাল হল ।

এই পথ আমি রাখি কোথায় ? আমার ছোট ঘর ,

ছোট আশা নিয়ে আছি বেশ

একটা লাল পথ চলে এলো , ভুঁইফুড়ে ঘরেতে আমার ,

সাথে নিয়ে এলো অনেক আলো -বাতাস , উজ্জ্বলতা ।

ঘর আমার ছোট তাই , মরমে মরে যাই ।

পথ শুধায় --জায়গা পাবো তোমার ঘরে ?

অরণ্য প্রান্তরে , অজগরের মতন আমি শুয়ে ছিলাম ।

এখন আমি শ্রমহীনতায় ক্লান্ত । আমি ঘরের স্বপ্ন দেখি

যেমন তুমি দেখো অরণ্যের স্বপ্ন ---

মাদল বাজে দূরে , শাল পিয়ালের বনে ----

হিয়ায় লুকিয়ে লালপথ ,

কৃষ্ণচূড়া, শিমূল, পলাশ , কিংশুক আর অশোক মাখা লালপথও

ঘর খোঁজে তাহলে ?

ভাইব্রেশান

বলো তো তানপুরার সুরটা কেমন ? আর মৃদঙ্গের ?

বলো তো সারেঙ্গী আর রুদ্রবীণা ,ওরা কি মিষ্টি ?

বলো তো তবলার বোল মধুর কি নয় ?

হারমোনিয়াম বড্ড ফেনায় , সুর ছড়ায়

পিয়ানোটা বিদেশী সুরে ভরায় ।

খোল করতাল বড় কানে লাগে

তবুও বৈষ্ণব – বৈষ্ণবী আবেশ জাগে

সেতারের মূর্ছনা মিহি লাগে , সন্তুরের সুর মিঠেল, বাজে।

হাজার বাদ্য যন্ত্র , হাজরো বোল তাল

তবুও বাজে কিন্তু একই সুর

সেই সুরেই ভুবন মাতাল।

সাত সুরে বাঁধি গানের মালা

কথা যাই হোক সুর মেখে হয়ে ওঠে ,সুখ ভেলা।

কবিতা ও গানে এই যে ফারাক,

লিকুইড্ কবিতাই তো গান ,

আমি চাই সুর মেখে ,কবিতা ভুবন ভরাক।

রাজপুতানী মেয়ে

ওগো রাজপুতানী মেয়ে

পড়ছে ঝরে সলমা চুমকী

তোমার কবরী বেয়ে !

ওগো রাজপুতানী মেয়ে

তুমি হাসলে নাচে ময়ূর

কাঁদলে ঝরে মুক্তো ,

সোনার বালিয়াড়ি হয়ে ।

রাজপুতানী মেয়ে

তোমার আশি ভরা জল

করছে টলমল

তাতে পড়ছে যে ছায়া

তোমার ভ্রমর কেশের মায়া

দেখেন নবাবজাদা চেয়ে

স্বপ্ন সিঁড়ি বেয়ে ।

ওগো রাজপুতানী মেয়ে

চাঁদের আলো মেখে

হয়ে ওঠো পরী

বনফুল কুন্তলে

নয়নে সুর্মা

নাকে নোলক

দোলে দোদুল দোলনা

হলেন পাগলপারা

ভিল রাজনন্দন,

ভরিয়ে দেন তোমায়

ফুলরাশি দিয়ে ,

ফুল , ফুল শুধু ফুল

ফুলের ওড়নায় চাপা পড়ে, তুমি ।

হল হীরক আংটি বদল ।

তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলে

ওগো রাজপুতানী মেয়ে ?

আসুন প্রত্নবিদ

খনন হোক বালিবন

জেগে উঠুক সত্য

হোক আবরন উন্মোচন ।

কেন ভিল পেলেন, পেলেন না রানা–রাজপুতানী মন !!

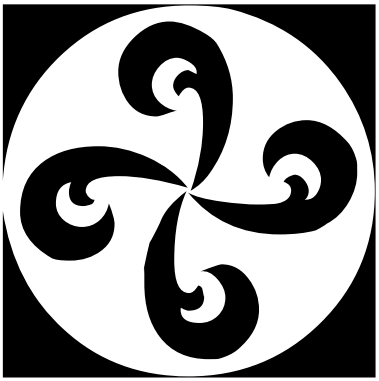

আহ্বান

শিলালিপি গুলো বড় ধোঁয়াটে

পড়া যাচ্ছে না একদম , ঘিরে ধরেছে রাশি রাশি কুয়াশা কণা

আমি পড়তে চাই , জানতে চাই , শিখতে চাই

কিন্তু সবটাই দেখি - অধরাই রয়ে গেলো ।

পাহাড়ের ওপাশে বসে একটা তোতাপাখি

দিব্যি খুটে খাচ্ছে জ্ঞান খড়কুটো,

সে দুদন্ড পড়ে ঋদ্ধ হবে, জ্ঞান মাধুরী আকন্ঠ পান করে

বিলিয়ে দেবে মানব সমাজ মাঝারে ।

আর আমি এত চেষ্টা করেও

ঐ কুয়াশা সরাতে পারছি না ।

অক্ষরমালা বিবর্ণ

চাপ চাপ বরফ মেঘে, ঢেকে যাচ্ছে চরাচর ।

তারপর শুধু নীরবতা , নি:স্তব্ধতা

জ্ঞান বারি নয় , ছিটিয়ে গেলো কারা যেন শান্তির জল ---

হয়ত আমি বার বার ফেল করে, ফেলুয়া উপাধি পেলাম বলেই !

মূর্খ আমি , ভগ্ন মানুষ !

তবুও কেন শ্রমণ , বোধি পথে তুমি আমাকেই ডাকলে ?

ফিউশান উপহার

জন্মদিনে তোমায় কী দেবো ?

কি চাও তুমি ? কেক , পেস্ট্রি , মিষ্টিদই ?

কখনো কী ভেবে দেখেছো যদি তোমায় আমি

আকাশ দিই ? যদি মুঠো মুঠো তারা দিই ?

যদি তুঙ্গভদ্রা কিংবা বিপাশাকে ডেকে আনি

পার্টিতে তোমার ?

কাঞ্জিভরম কিংবা বেনারসির বদলে

পারিনা কি তোমায় দিতে মেঘনীল ?

নিজেকে আচ্ছাদিত করো না বনানীর সবুজে

ক্ষতি কী ?

দূর্বার ঝর্ণা হোক তোমার আনন্দ লহরী

হিমালয়ের চূড়া থেকে নিয়ে আসি এক রাশ বরফ

হাস্কি ভয়েসের মদিরাবতী হুল্লোড়ে, উষ্ণ শহর কলকাতায়

ওরাই হোক তোমার এক গুচ্ছ বার্চ ফুল।

কিংবা পাহাড়ি গোলাপ , নাই বা ছিল সুবাস

তবু আজও সে নির্মল --

সুনির্মল পাহাড়িয়া সূর্যাই মেখে

যেখানে লাগেনি আঁচ শহুরে কুস্তির---

কিন্তু মুশকিল কী জানো ?

ওরা কেউ জন্মদিনের পার্টিতে উপহার

হয়ে আসতে চায়না। আমাদের ; দানবীয় শহুরে

মানুষের উদ্ধত কোলাহলকে ওরা ভয় পায় ।

তাই লুকিয়ে পড়ে , পিছিয়ে যায় --

পাছে বত্তমিজ বলে ঠাট্টা কুড়ায় !!

স্পাই ক্যাম

চোখেরা চারিদিকে

আমায় পর্যবেক্ষণ করে চলেছে সদাই ।

ওয়েবক্যাম , মোবাইল , শত শত চোখে চারিদিকে

তোমার প্রতিটা মূহুর্ত

প্রতিটা দিন উঠে যাচ্ছে

অজানা কোনো মণিতে ।

কর্নিয়াটায় দেখি নিজের ছায়া

ভ্রুপল্লবে কেন কুঞ্চন ? কোন চোখে দেখেছে সে আগে ?

জেনে নিয়েছে আমার সব কিছু , প্রথম পরিচয়ের পূর্বেই ।

ভয় হয় -- আমি ডরাই

চোখেরা আজ চারিদিকে, তাই !

বিজ্ঞান কয়েক শতাব্দী শীতঘুমে যাক , কিংবা হোক্ পরিযায়ী পাখি
নাহলে বাঁচবে না লুকোনো জীবন -- পাপগন্ধ মাখা নির্মাণ,

আমাদের একান্তই যা কিছু গোপন ।

বাক্স

একটা কাঠের বাক্সের পাশে আমি থাকি

বড় মোটা বাক্স ।

ভেতরে কিছু আবর্জনা --স্তুপাকৃতি জঞ্জাল ।

তবুও বাক্সটা প্রয়োজন ,

জঞ্জালগুলো ফেলে দিলেই চলে , জঞ্জাল জমিয়ে কি লাভ ?

মায়া , বড় মায়া ঐসব বস্তুকে ঘিরে

একটা অমোঘ টান , সেই টানই নিয়ে যায় আমায়, বাক্সের দিকে

জঞ্জাল বলো যাকে সেসব অস্তিত্ব হারানো পুরনো বস্তু ।

প্রাণে ধরে ফেলতে পারিনা । এক সময় ছিলো একান্ত আপন !

খুলিও না কোনদিন তবুও বাক্সটা রয়ে যায়

আরশোলা আর ইঁদুরের বাসা

থাক না , ওরাই বা যাবে কোথায় ? বাক্স বদল হলে ওরাই বা যাবে কোথায় ? একেই কি বলে নির্ভরতা ? বাক্স নির্ভরতা ?

এই থিওরির ওপরেই ভিত্তি করে

কি গড়ে উঠেছিলো মমি কালচার ?

আমরা বলি মৃতদেহ , জঞ্জাল

ওরা বলে নির্ভরতা --

ওরা , ঐ আরশোলা আর ইঁদুরেরা !

আমাদের জঞ্জাল , ওদের একমুঠো মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সভ্যতা ।

সরল জটিলতা

যারা কবিতা প্রেমী,

তাদের কবিতা না এলে ভালোলাগেনা ।

খাতার পাতায় পাতায় কলমের আঁচড়

অষ্টরম্ভা লেখার হাত--তবুও আমি কবিতা লিখি,

কখনো কবিতা হয়--কখনো কবিতার ছায়া মাত্র পড়ে খাতায় ।

কিন্তু কী নিয়ে লিখি বলতো ??

পাশের বাড়ির হতশ্রী মেয়েটি রূপের বিদ্রুপ সইতে না পেরে

গলায় দড়ি দিয়ে অল্প বয়সে মারা গেলো ।

পরিবারে সৎ মায়ের কাছে সে , রাক্ষসী ।

ছেলে বললো , মা শালুকদিদি কোথায় গেলো ?

আমি বললাম : পরীর দেশে ।

কদিন পড়ে মারা গেলেন রিয়েলিটি স্টার জেড গুডি ।

ছেলে বললো : মা জেড কোথায় গেলেন ?

আমি বললাম : পরীর দেশে !

ছেলে এবার হেসে বললো : সবাই যদি পরীর দেশেই যাবে

তবে জেড তারকা আর শালুকদিদি কেন তারকা রাক্ষসী ?

আজকালকার শিশুদের **আই কিউ** অনেক বেশি ,

মিছে কথায় তোমায় ভোলাবো না বাছা !

সত্যি বলার জন্য বুকের পাটা লাগে , তা আমার আছে ,

আকাশের নক্ষত্র গুনতে গুনতে উত্তরটা দিতে গিয়ে দেখি

ছেলে আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ,

বুকের ওপরে খোলা একটা বই-নাম তার ,

-- ***কী করে চিনে নেবে আকাশের তারা*** --

নিচে পেন্সিল দিয়ে এলোমেলো হাতে লেখা

আমার দুই তারা , আমি চিনতে চাই

কে শালুকদিদি আর কে জেড গুডি ।

পিকাসোর ভূত

মহান শিল্পী পিকাসো !

কিছু কথা বলি তোমায় শোনো ।

তুমি সংবেদনশীল , তুমি স্রষ্টা

তবুও আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা ।

তোমার অঙ্কনে যখন রঙের ঢল

আমার মনে সফেদ বিষন্নতা । তোমার রেখাচিত্রে

শৈল্পিক গরিমা , আমি স্তব্ধ ;

মনে বেদনার কালিমা ।

ক্ষমা করো পিকাসো , ক্ষমা করো আমায়

ভালোবাসাবাসি হলনা এই জন্মে

তোমার সৃষ্টি সনে ।

লোকে নিন্দে করে , বলে আমি মোটামাথা

আমি পিকাসো বুঝিনা ।

কিন্তু পিকাসো তুমি বলো , আমি তো নেহাৎ-ই আমিই ।

অধিকার কি নেই আমার নিজস্ব ভালোলাগা আঁকড়ে বাঁচার ?

তার জন্যে কেন শুনতে হবে ---আমি অর্ধশিক্ষিত , মূর্খ ,

আমি পিকাসো বুঝিনা !

তুমি যেমন তুমিই , নিজ উজ্জ্বলতায় ভাস্বর , সূর্যের মতন

আমিও তো আমিই ? হইনা মামুলি এক কাচপোকা !

তাহলে আমিও পারি --নিজ শৈলি বেছে নিতে ?

যেমন কাচপোকারা থাকে নিজ জগতে । তারা আছে বলেই আছে সূর্যের মহিমা ।

বলো , পিকাসো -আচ্ছা পিকাসো তুমি লজিক বোঝো ?

তুমি কী পারো ? একটা মাত্র সরলরেখা এঁকে তাতে আবেগ বসাতে পারো ?

কেন সবাইকে বুঝতে হবে পিকাসো ??

আমি আমার সীমারেখাতেই ঋদ্ধ

কারণ আমিও তো পিকাসো নই ,

পিকাসো নই , পিকাসো নই ।

মামুলি এক কাচপোকা । তবুও পোকার ভুবনে আমি সিদ্ধপুরুষ ।

কি হে মহান পাবলো দিগো জোস---অক্ষর অক্ষর অক্ষর --সান্টিসিমা ত্রিনিদাদ ---অক্ষর অক্ষর -বুইজ পিকাসো !

একটি মাত্র সরলরেখা আর সময় মাত্র তিন মিনিট --

টাইম স্টার্টস্ নাও, টিক্ টিক্ টিক্ টিক্---------!

চন্ডাশোক

কলিঙ্গ প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে

এক বঙ্গ তনয়া ছিল দু হাত বাড়িয়ে ।

কোথায় সেই সোনার রাজত্ব ?

কোথায় ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র ?

ধূ ধূ প্রান্তরে একাকিনী আমি

অস্তমিত সূর্য , ক্লান্ত পাখির কলতান

আরেকটি দিন যায় ।

তোমাকে খুঁজে ফেরা এখন আমার যাপন ।

হে সম্রাট অশোক , ময়ূররাজ , বিদিশার দিশারী ,

হে প্রিয়দর্শী , ধর্মাশোক !

কোথায় তুমি ?

পারোনা একটি শুধু একটিবার

খনন কার্য মাঝে আবির্ভূত হতে ,

ইতিহাস মাখা পাথুরে পারাবার–

তুমি কি জীবন্ত হতে পার ?

আমি দেখি , দু চোখ ভরে শুধু দেখি তোমায় ।

হায় ! হে দিগ্বিজয়ী , হে নাথ –

কেন তুমি এত বিলম্ব করলে

বোধি পথে হতে অবলুপ্ত ?

কেন তোমার মতন বীর বিক্রমকে

এত মানুষ হনন করে

উপলব্ধি করতে হল

মানুষ মারা পাপ ?

সেকি তুমি রাজাধিরাজ বলে ?

তোমার আলাদা অহং ছিল বলে ?

মুকুটে ছিলো একটি জ্বলন্ত অঙ্গার ?

নাকি সত্যি সে কোনো এক নির্বোধের

কোনো যুগের --ভয়ঙ্কর অভিশাপ ?

আম্রপালির বিবেক

দত্তক নিয়েছিলাম এক শিশুকে ,

এনেছিলাম তুলে অ্যাফ্রিকার ঘনিমা থেকে

মুন্ডিত মস্তক , কৃষ্ণবর্ণ

সস্তার চটি পায়ে , পোশাক জীর্ণ ।

আমার অট্টালিকায় করলাম তাকে মানুষ , নাম দিলাম আম্রপালি ।

বললেই হল ? মানুষ নাকি ফানুস ?

গগনে গগনে মেলে পাখনা

উড়ে যায় পোষ্যটি আমার --

আজ বেলুচিস্তান কাল সুইডেন,

পরশু ন্যু ইয়র্ক তরশু কোপেনহেগেন

মানুষ করেছি তাকে !

সে ভুলেছে তার পালক বাবা মাকে

একটি ঘর দিয়েছিলো যারা

আজ তাদেরই হাতে পরিয়ে দিলো লৌহকড়া !

কিসের আশায় বুকে টেনে নেবে

ছত্রহীন কটি কচি মুখ ?

শুধু ঘর দিতেই জানি ? ঘরের আশ্বাস পাবো না ?

কী করে তা মানি ?

লাভা পড়ে । হিমবাহ থেকে চুইয়ে চুইয়ে

এতদিন যাকে আপন বলে জেনে এসেছি , পেয়েছে আপন ঘর ----
আজ সে পর !

নিন্দুকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ---

আম ফল কি জাম গাছে লাগে ?

দ্যাখো , বলেছিলাম আগে !

কার্বন ট্যাক্স

তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও বারুদের জালে

ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পৃথিবী নিরন্তর

সবুজাভা নেই --নেই লাল পাহাড়ের ঢেউ

যেদিকে তাকাই বড় বিস্ময় জাগে

বেঁচে আছি এ কোন তীব্র আঁধারে ?

কঙ্গো থেকে নীলনদ তট ,

কাবেরী থেকে গঙ্গার প্রেক্ষাপট

ঢেকে আছে ঊষ্ণতায় , ঢেকে আছে আবর্জনায় ।

এসো দুহাত বাড়িয়ে

শুধু ধোঁয়া সরাই , কার্বনের ধোঁয়া ,

রেডিয়ামের ধোঁয়া , মিথেন অসুখ , ক্রোমিয়াম মুখ ।

জাল কেটে যাই , এগিয়ে যাই আর যাই

পরীর দেশে , সূর্যের মুখ দেখবো বলে ।

লাল পাহাড়ের, কমলা আবীর মেখে খেলবো

সবাই মিলে ডুবে যাবো স্নিগ্ধ , সবুজ , প্রাচীন নীলিমায় ।

আমরা কার্বন বোরখা খুলে ফেলেছি ,

সৃষ্টির আদিম দুনিয়া না পেলেও আজ

মুঠো মুঠো কাকজোছনা চাই !

সূর্য চশমা

রোদচশমা পরে রোজ সুন্দরী যায় ঘরে

হঠাৎ দেখে চশমা হারিয়েছে চিরতরে !

রোদচশমা খুঁজে ফেরে ,দূরবীন নিয়ে বুড়ো

হারিয়ে গেছে চশমা আমার -হারিয়ে গেছে পুরো !

রোদচশমা পরে যদি ভূ-ভারতকে দেখো

আসল জগৎ সেরকমই -মোটেই ভেবো নাকো !

রোদ ঢেকে দেয় রোদচশমা ,জুড়ায় চোখের গ্লানি

খুলে ফেললে দেখবে তুমি --রাস্তা ভরা পানি !

গলা জলে হাবুডুবু খাবে তুমি তখন

রোদচশমা খুলে ফেলো , হও সাবধান এখন !

রোদ চশমা, রোদ চশমা কোথায় তুমি গেলে ?

হয়েছি আজ শুধু চশমা , মুখোশখানি খুলে।

ভারত মঞ্জরী

এই যে চারিপাশে এত সজ্জা , মাখনের মতন শয্যা -

শপিং মল , নগ্ন সুন্দরী , ফুলের তোড়া --অস্কার

পারবে কি ঢেকে রাখতে আসল ভারতকে ?

যতই মখমলের চাদর বিছাও

তারা ওড়না , জামদানি সাজ

ভেতরের জরাজীর্ণ রূপটা বদলায় না

তার কি আভাস পাও ?

ভগ্ন , ক্ষয়াটে , নির্মেদ মুখগুলো

ঢাকা পড়ে ক্ষণিকের আলোয়

অন্তরে তারা ক্ষতবিক্ষত মোমের পুতুল !

যে কোনো শিশু অনায়াসে পারে ,

টেনে হিঁচড়ে বার করে আনতে ঐ পুতুলদের লুক্কায়িত বায়োলজি ।

মাথা

মাথার ওপর মাথা

তার ওপর মাথা

আরো মাথা

আরো আরো মাথা ,

হে ভূমি, এত মাথা দিয়ে করবে কী?

মাথার চাপে কাঁপে বৃক্ষরাজি ,

আগুনের গোলার মতন ছুটে চলে

মানুষের কঙ্কাল -মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজে নিতে -----

অকস্মাৎ বিস্ফোরণ ! উগ্রহানা নয় , তবু মানব বোমা ,

কী করে ?

কেন , জন-বিস্ফোরণ ---

মাথার ওপর মাথা হঠাৎ হামপ্টি ডামপ্টির মতন ফেটে চৌচির,
কলকাতা থেকে হিরোসিমা ।

শেষ অঙ্ক

তারপর সেই একঘেয়ে বাজনা ,

সমস্ত তুমি আমির শেষ ,

ঝরঝরে কথা , শ্লেষ্মা , বীজ রোপন

সংঘাত , আলাপন -- কখনো বা সমাজকে তোয়াক্কা না করার প্রহসন !

ঈশ্বর ডুবে যান রাতের গভীরে

উড়ু বেয়ে নামে রূপালি চাঁদ

তখনো , জানো তখনো বোঝা হয়নি সম্পূর্ণ

শেষ অঙ্কের অপেক্ষায় থাকে আমার নির্বাসন ।

দু একটি শব্দ খুঁজে ফেরে-- নি:সঙ্গ জীবন

হয়ত তারাও সঙ্ঘবদ্ধ ,

খুঁজে ফেরে শেষ অঙ্ক , আমারই মতন ।

টেরাকোটা পুতুলের গীত

প্রতিটি রবিবার আসে হাসনুহানার গন্ধ মেখে

সারাদিন ছুটির মেজাজ , দেরি করে বিছানা ছাড়ি

পরোটা কিংবা আলুর চপ , ভুরিভোজ সারি ।

দুপুরে লাউডান স্ট্রিটের অ্যাংলো পাড়ায় ঘুরি

হাতে ছোট সস্তার থলি ,

মাওবাদীর কবলে হাসিখুশি কলকাতা

রবিবারেও বোমা বিস্ফোরণ,

সোনার দাঁত খুলে নেয় দূর্যোধন

পরোটা , আলুর চপে রক্তের দাগ

তবুও বেঁচে আছি -আমি দলপতি

কলকাতা আছে কলকাতাতেই

মেরো পট্টি , চীনা বাজার ঘুরে -ঘরে ফিরি

বোমা দিয়ে বানাই বিকেলের কাটলেট

মুর্গির বদলে ভরি নরমাংস

বিষাদে ভরা আকাশ বাতাস - রবিবারের রোদ আছে কল্লোলিনী পরে,
শুধু তার রঙখানি গিয়েছে চুরি ।

ঘুমপরী বিন্দাস্

হিমালয় থেকে কুমারিকা , সফটওয়্যার থেকে ভূবিজ্ঞান , হোটেল টু মোটেল -আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া ,

সাহিত্য থেকে শিল্প , ডাক্তারি থেকে ফার্মাসি ,

ফুটবল থেকে টেনিস , সাঁতার থেকে কবিতা ।

পদব্রজে ঘুরলাম সমস্ত ক্ষেত্র । একবার নয় বহুবার ।

কিন্তু বিন্দাস্ পেলাম না একটিও ।।

হে পৃথিবী -- **তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আকরিক বিশ্রাম কোথায় ????**

রাইকমল

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে । সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভুটানঘাট । ডুয়ার্সের এই এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা । এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয় তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক , হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

শেষ

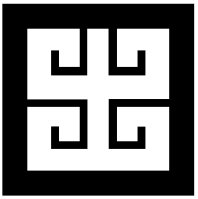

THE END